ইচ্ছামতী

শীত সংখ্যা ২০১০

সূচীপত্র

প্রথম পাতাঃশীত সংখ্যা ২০১০.....1
শীতের অ্যালবাম.....4
উজ্জ্বল অধ্যায়: পর্ব ২.....11
ছড়া-কবিতা.....13
জমজমাট.....13
বরফবুড়ো.....14
প্রকৃতির ধর্ম.....16
বন্ধু পাতানো.....18
গল্প-স্বল্প.....19
সরল ও হাতি.....19
আবিষ্কার.....26
মৌমাছি ও শামুক.....32
আনমনে: আমার ছোট্টবেলাঃ পর্ব ৬.....37
মনের মানুষ: আশাপূর্ণা দেবী.....43
পড়ে পাওয়া: কখন কি হয়.....45
দেশে-বিদেশে.....47
শিবঠাকুরের আপন দেশে.....47
লাস ভেগাস.....57
ছবির খবর: দুপায়ের ঘোড়া.....65
বায়োস্কোপের বারোকথা: স্টুডিও ব্যবস্থা.....70
পরশমণি: বাষ্প নিয়ে আরো কথা.....74
কমিক্স্ কাহিনী: স্যান্টাক্লসের চিঠি.....80
এক্কা-দোক্কা: ঘুড়ি ওড়ানোর মজা.....82
আঁকিবুকি.....87

প্রথম পাতাঃশীত সংখ্যা ২০১০

কি গো ইচ্ছামতীর বন্ধু, কেমন আছো? সেই পুজোর পর থেকে তো আর তোমার সঙ্গে কথাই হয়নি... তুমি ভালো আছো তো? পুজো সংখ্যার পর নতুন সংখ্যা নিয়ে একটু ধীরে ধীরেই এলাম। অনেকটা এবারের শীত বুড়োর মত! এসেও যেন আসতে চাইছিল না। দু'পা এগোচ্ছে তো তিন পা পেছোচ্ছে! এদিকে তো ক্যালেন্ডারের পাতায় অগ্রহায়ন মাস পেরিয়ে পৌষ মাস পড়ে গেছে কবে! অথচ আমার ঠান্ডাই লাগছিল না। এখন অবশ্য অবস্থা উলটো। কনকনে উত্তুরে হাওয়া আমার দরজার বাইরে নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটু সুযোগ পেলেই হল- হু হু করে ঢুকে পরে কাঁপিয়ে দিচ্ছে আমার সারা শরীর।

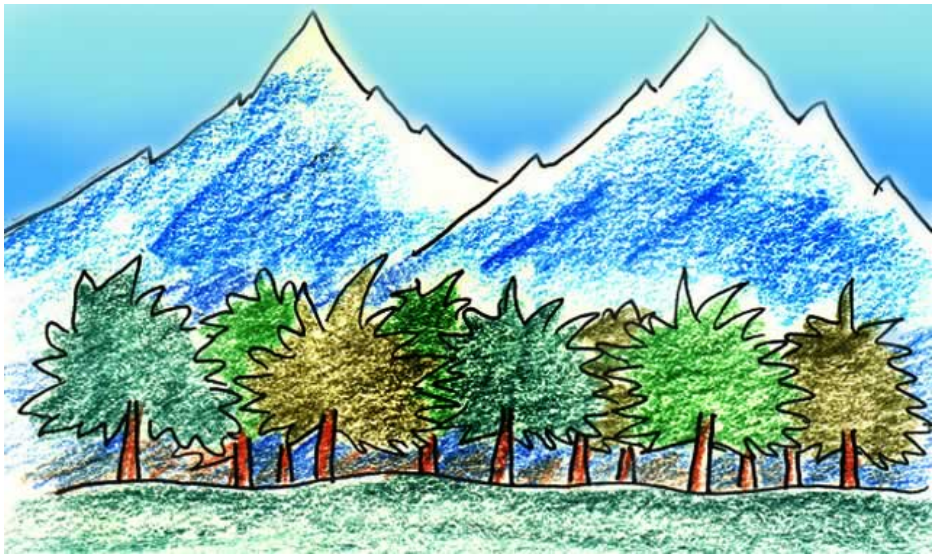

এইসব দিনে, ঘরের ভিতর চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আমি ভাবি সেই সব মানুষের কথা, এই শীতে যাদের মাথার ওপর ছাত নেই, অনেকেই যারা রাস্তায় বা ঝুপড়িতে বসবাস করে। তাও তো ভাল যে সূয্যিমামা দিনের বেলা আলোয়, উষ্ণতায় ভরিয়ে রাখেন পৃথিবীকে। ঠান্ডার সাথে মোকাবিলা করতে সূয্যিমামা আমাদের বড় বন্ধু। শুধু সূয্যিমামা কেন- আকাশ, জল, মাটি, হাওয়া, গাছপালা, সবাই আমাদের বন্ধু। সবাই আমাদের সুস্থ, সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। কিন্তু আমরা নিজেরা কি এদের ভালোভাবে থাকতে দিই? আমরা সবসময়ই দুষ্টু ছেলেমেয়েদের মত এমন সব কাজকর্ম করছি, যে তাতে প্রকৃতি এবং আবহয়াওয়ার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর সেই সব অন্যায়ের ফল কিন্তু

আমাদেরকেই ভোগ করতে হচ্ছে। এই যেমন আমাদের এখানে শীত কত দেরি করে এল, আবার এবছর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং আমেরিকার কিছু অংশে এত বেশি তুষারপাত হয়েছে এবং এমন ঠাণ্ডা পড়েছে যে মানুষ স্বাভাবিক জীবনযাপনই করতে পারছে না! এদিকে আবার ক্রমশঃ কল-কারখানা-গাড়ী বেড়ে যাওয়ায় অনবরত ধোঁয়া- ধুলোর মাত্রা বেড়ে গিয়ে পৃথিবীকে ক্রমশঃ গরম করে তুলছে। এইভাবে চলতে থাকলে পৃথিবীর উষ্ণতা আরো বেড়ে যাবে। তার ফলে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর জমে থাকা বরফ গলতে শুরু করে দেবে, আর সেই বরফগলা জল সমুদ্রের জলে মিশে গিয়ে সমুদ্রের উষ্ণতা বাড়িয়ে দেবে। তার ফলে কি হবে জানো? সমুদ্রের কাছের বহু শহর এবং অনেক দ্বীপ পুরোপুরিভাবে জলের তলায় হারিয়ে যেতে পারে! এইরকম ভয়াবহ পরিস্থিতি যাতে না আসে, সেই নিয়ে আলোচনা করতে বিশ্বের ছোট-বড় বিভিন্ন দেশের নেতা এবং সাধারন মানুষ সবাই জড়ো হয়েছিলেন ডেনমার্কের কোপেনহেগেন এ। আবহাওয়ার ভারসাম্য কি করে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে সেখানে নানা আলোচনা হয়েছে।

কিন্তু আবহাওয়ার ভারসাম্য বা পরিবেশকে সুন্দর রাখার দায় তো শুধুমাত্র কয়েকজন মানুষের নয়! এ তো আমাদের সবার দায়িত্ব, তাই না? সেজন্য আমাদের সবাইকেই দায়িত্ব নিতে হবে, জানতে হবে, কি করে পৃথিবীর উষ্ণতা আমরা কম করতে পারি, কিভাবে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারি। তুমিও না হয় এ বিষয়ে একটু পড়াশোনা করো, আর আমাকে চিঠি লিখে জানাও কি ভাবে তুমি পৃথিবীকে সাহায্য করতে পারো।

এবার একটু ইচ্ছামতীর কথায় আসা যাক। ইচ্ছামতী কিনা এক বছরের বড় হয়েছে, তাই ইচ্ছামতীর হাবেভাবে কিছু কিছু বদল হয়েছে। ইচ্ছামতী এখন থেকে প্রকাশ হবে বছরে চারটি সংখ্যায়। আয়তনেও একটু বড় হয়েছে ইচ্ছামতী। আমরা চেষ্টা করছি বেশি বেশি করে গল্প, ছড়া এবং অন্যান্য নিয়মিত লেখা দিতে। এ বিষয়ে কিন্তু তোমার মতামত আমার কাছে খুব জরুরী। তুমি কি ধরনের লেখা পড়তে চাও, তা চিঠি লিখে জানিও আমায়।

এই সংখ্যায় আছে পিন্টু, টুবলু আর সরলের গল্প; আছে হাতি, শামুক আর মৌমাছির গল্প; তার সঙ্গে আমরা বেড়াতে যাচ্ছি একদিকে লাস ভেগাস তো অন্যদিকে বেনারস। আছে দেশ-বিদেশের বন্ধুদের আঁকা ছবি আর অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ। তবে গত সংখ্যায় 'জানা-অজানা' বিভাগে শুরু হয়েছিল

নতুন ধারাবাহিক 'মারথোমা নাসরানিদের দেশে'। এই ধারাবাহিকের লেখকের বিশেষ অসুবিধা থাকায়,এই সংখ্যায় এই ধারাবাহিকের দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশ হল না।

তাহলে আর কথা বাড়িয়ে কাজ নেই! শিগগির পড়তে শুরু করে দাও নতুন ইচ্ছামতী।

আর হ্যাঁ, কথায় কথায় তো তোমাকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানাতে ভুলেই গেছি! - এই রইলো তোমার জন্য নতুন বছরের অনেক শুভেচ্ছা। নতুন বছরে নতুন নতুন প্রতিজ্ঞা করলে নাকি? -রোজ সক্কাল-সক্কাল ঘুম থেকে উঠবো...আর দুষ্টুমি করবো না...সতেরোর নামতাটা মুখস্থ করেই ফেলবো...তার সাথে নাহয় ঐ প্রথমে যে সব কথা হল - পরিবেশ এবং আবহাওয়া নিয়ে, সে বিষয়েও কয়েকটা প্রতিজ্ঞা করে ফেল! তবে প্রতিজ্ঞা করলেই হবে না, সেটাকে মেনে চলতেও হবে। নাহলে এত এত প্রতিজ্ঞা করে কোন লাভ নেই।

এবার কলম থামাই।
ইচ্ছামতীর জন্য পাঠিও তোমার লেখা আর আঁকা ছবি।
তোমার নতুন বছর ভালো কাটুক।

চাঁদের বুড়ি

শীতের অ্যালবাম

শীতের ঘন কুয়াশার মধ্যে আমাদের বাস যখন ভসরা ঘাটে থামলো তখন বুঝতে পারিনি সামনে কিছুটা হাঁটলেই সুবর্ণরেখা নদী।

খেয়া পারাপারের জন্য অনেক যাত্রী সেখানে উপস্থিত। আমিও উঠে পড়লাম।

তুমি হয়তো এখোনো মনে মনে ভাবছো আমি চলেছি কোথায়। সত্যি বিশ্বাস করো চাঁদের বুড়ি যখন আমাকে শীতের লেখা লিখতে বললো তখন আমি ভাবছি কোথায় যাবো!

এমন একটা জায়গায় আমাকে যেতে হবে যেখানে এই নবান্নে সবাই আনন্দে মেতে আছে। সিরাজুলকে ফোন করলাম কিন্তু সিরাজুলের সামনেই পরীক্ষা। আর এই শীতে সুন্দরবন থেকে সিরাজুলের আসাটাও বেশ কষ্টকর। তাই হঠাতই একদিন নিজেই বেড়িয়ে পড়লাম আমার দিদির বাড়ি নয়া গ্রামে।আচ্ছা দাঁড়াও নৌকা থেকে নেমে এখোনো হাঁটা পথে অনেকটা পেরোতে হবে সুবর্ণরেখা নদী।

দিদি যখন আমাকে চিঠি লিখলো তখনো মনে মনে ভাবতে পারিনি এমন এক সুন্দর গ্রামে আমি আসছি। নতুন ফসল ঘরে তোলার যে আনন্দ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তা বাড়ির সামনের আলপনা দেখে বোঝা যায়।

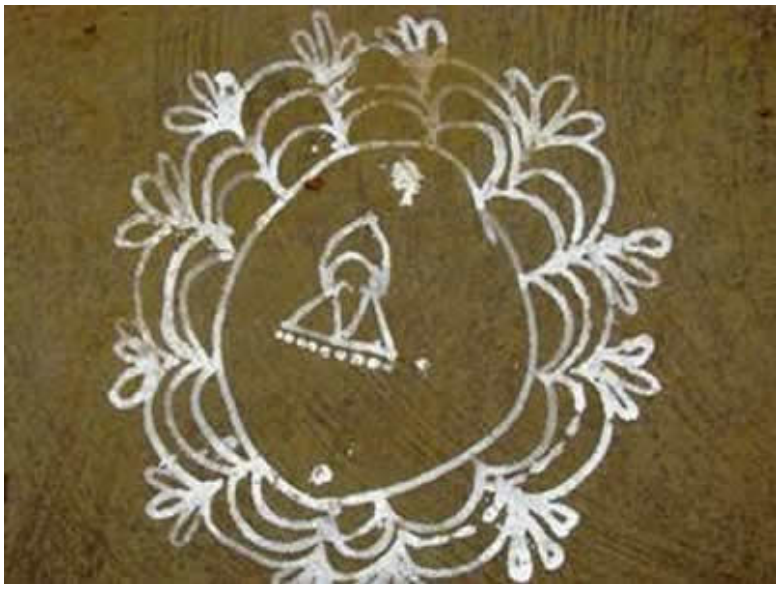

কেউ করেছেন লক্ষ্মী পুজো আবার কোনো আদিবাসী পরিবারের কোনো মহিলা সারাদিনের কাজের ফাঁকে এঁকেছেন ময়ূর।

ফসল ঘরে তোলা বললেই তো আর ঘরে তোলা নয় তার সাথে জড়িয়ে আছে আরো অনেক কিছু। বাড়ির সবাই তাই কাজে ব্যস্ত। এমনকি ক্লাস নাইনের অমর আর সেভেনের অমৃতা বাবা মাকে সাহায্য করছে ধান ঝাড়ার কাজে।

কেউ কেউ এই শীতে আগুন পোহাতে বসেছেন। জড়ো হয়ে বসে সবাই মিলে আগুন পোহাচ্ছেন।

তুমি যদি এই গ্রামে কোনো দিন আসো তাহলে দেখবে এখানে হাতি চারিদিকে কেমন যেন ঘুর ঘুর করছে। এরা কিন্তু কেউ পোষা হাতি নয়। সবাই জঙ্গলের।

হাতি গ্রামের মানুষের ফসলের অনেক ক্ষতি করে। তাই অনেকেই এবার ফসল ঘরে তুলতে পারেনি। যারা পেরেছে তাদের মুখে হাসি ফুটেছে। যারা পারেনি তারা বছরের প্রথম থেকেই কষ্টে চালাবে। জঙ্গলের কাঠের ওপর তাদের ভরসা। কিন্তু সেটা বিক্রি করেও বা তাদের আর কত টাকা উপার্জন হবে...

তাই অনেকে বাবুই ঘাস দিয়ে ঝুড়ি, অন্যান্য কাজের জিনিষ এবং শৌখিন জিনিষ তৈরী করতে শিখেছেন। সেগুলো বাজারে বিক্রি করবেন।

ফিরে আসছি, আমার খুড়িমা ডেকে বললেন পিঠা পুলির সময় এসেছো আর কিছু খেয়ে যাবে না তাও কি হয়? তিনি পাটিসাপটা ভাজতে বসলেন।

তুমি পাটিসাপটা দেখে লোভ দাও আর আমি সেই ফাঁকে বাড়ির পাশের ঝিলে শীতের পাখি দেখে আসি কেমন...

কল্লোল

উজ্জ্বল অধ্যায়: পর্ব ২

রেবতীভূষণ ঘোষ

বেলা গড়িয়ে দুপুর। ভাত ঘুমের প্রস্তুতিও হয়তো চলছে বাড়িতে বাড়িতে। ঘড়ির ছোট কাঁটা এক চক্কর দিয়ে আর এক চক্কর দিতে ছুটছে। এমন সময় বাগান ঘেরা এক বাড়ির বারান্দায় ভিড় জমাচ্ছে দোয়েল, ফিঙে, বুলবুলিরা। সকালের জলযোগ সেরে তিনি আসতেন বারান্দায়। ছুঁড়ে দিতেন পাউরুটির টুকরো,বিস্কুটের ভাঙা অংশ কখোনো বা অন্য কিছু।

আর শূন্যে ছোঁ মেরে সেগুলোকে মুখে নিয়েই তারা ধাঁ। কেউ কেউ আবার খেলা দেখাতে গিয়ে শূন্যে একটা ডিগবাজিও খেয়ে নিল। চড়াই গুলো এতক্ষণ তাঁর খাবার টেবিলের চারিদিকে ঘুরঘুর করছিলো...এবার তারা উড়ে এলো বারান্দায়।কাকের দল মাঝে মাঝে জ্যাম মাখানো পাউরুটির দিকে লোভ করে তাড়া করতো চড়াই গুলোকে আর তিনি কাক দের তাড়া করতেন গুলতি দিয়ে। কিন্তু জানো তো সেই গুলতিতে কোনো ঢিল থাকতো না। বড় ভালোবাসতেন পাখিদের রেবতীভূষণ।ছোট থেকেই পাখিদের সঙ্গে পাতিয়েছিলেন বন্ধুত্ব। পাখিদের নিয়ে তাঁর আগ্রহ আর কৌতূহল ছিলো খুব। দেশ বিদেশের পাখিদের নাম ধাম, মতি গতি জানার জন্য অনেক বই পত্র ছিলো তাঁর সংগ্রহে। পাখিদের ছবিতে তিনি যোগ করেছিলেন গতি। যে গতি তাঁর পাখিদের উড়িয়ে দেয় নীল আকাশে। তারা ডানা মেলে, মিলিয়ে যায় দূর দিগন্তে। সেই পাখিদের নিয়েই লেখা অনেক ছড়ার একটা এবার ইচ্ছামতীতে।

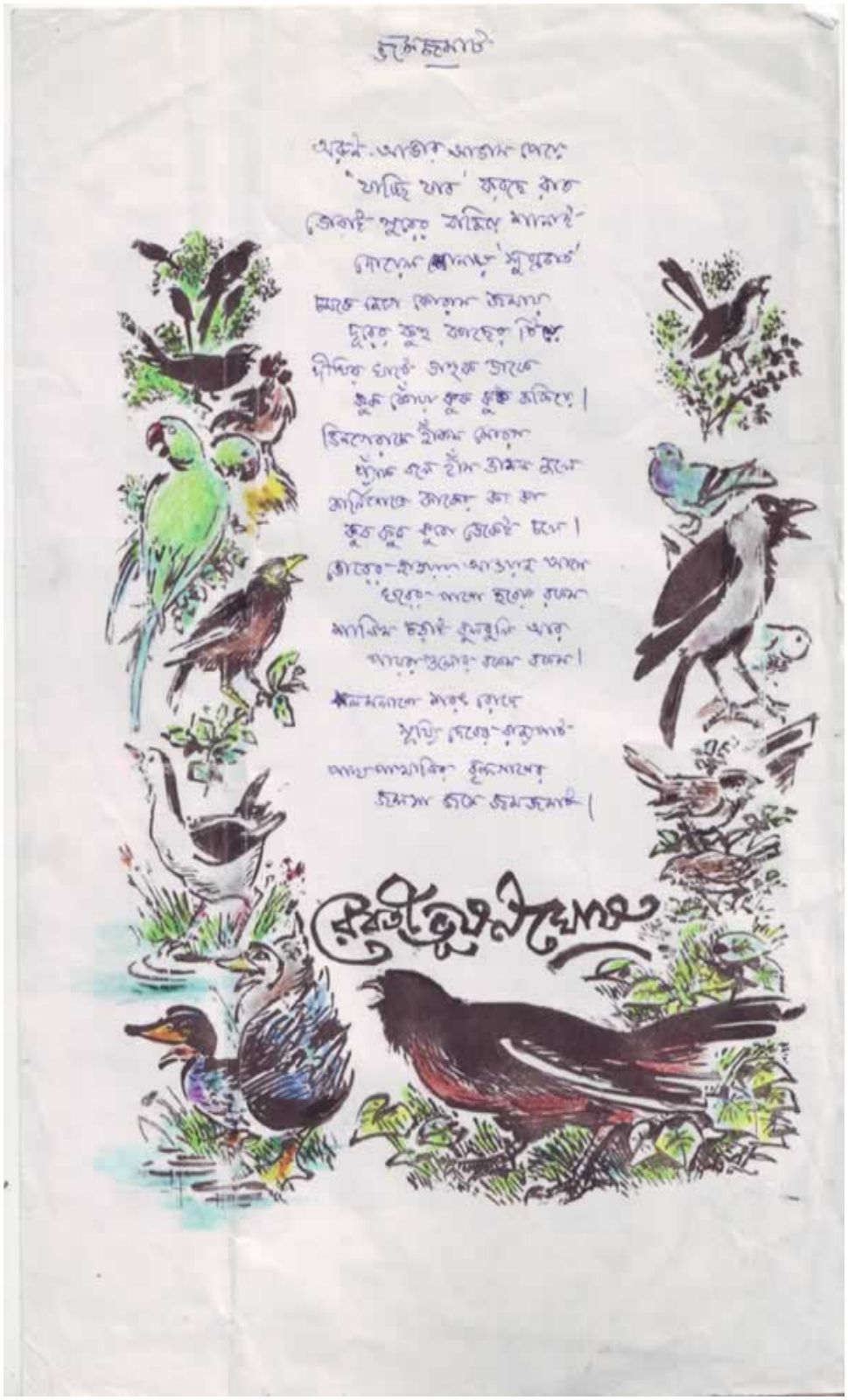

ওপরের ছবিতে হাতে লেখা ছড়াটি ছাপার অক্ষরে দেওয়া আছে পরের লিঙ্ক ছড়া/কবিতা ১ এর পাতায়

ছড়া-কবিতা

জমজমাট

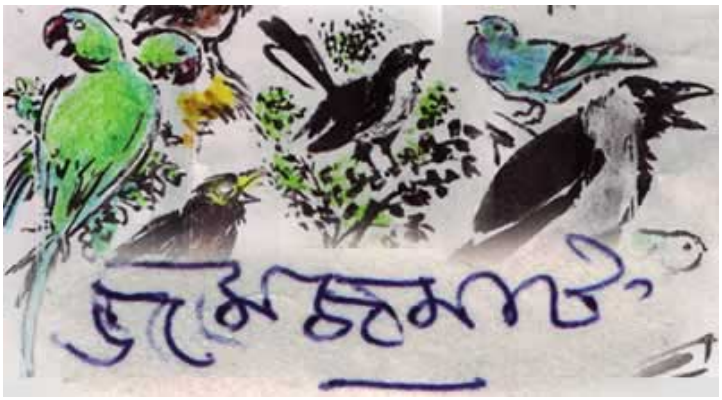

অরুণ-আভার আভাস পেয়ে
'যাচ্ছি-যাবো' করছে রাত
ভোরাই সুরের বাজিয়ে শানাই
দোয়েল শোনায় 'সুপ্রভাত'
চমকে জেগে কোরাস জমায়
দুরের কুহু কাছের টিয়ে
দীঘির ঘাটে ডাহুক ডাকে
কূঁক কোঁয়া কূঁক কূঁক ককিয়ে।
ভিনগেরামে হাঁকল মোরগ
প্যাঁক বলে হাঁস ভাসল জলে
কার্নিসেতে কাকের কা কা
কুব কুব কুবো ডেকেই চলে।
ভোরের হাওয়ায় আওয়াজ আসে
ঘরের পাশে হরেক রকম
শালিখ চড়াই বুলবুলি আর
পায়রাগুলোর বকম বকম।
ঝলমলানো শরত রোদে
সূয্যিদেবের রাজ্যপাট
পাখপাখালির বৃন্দগানের
জলসা জমে জমজমাট।

রেবতীভুষণ ঘোষ

বরফবুড়ো

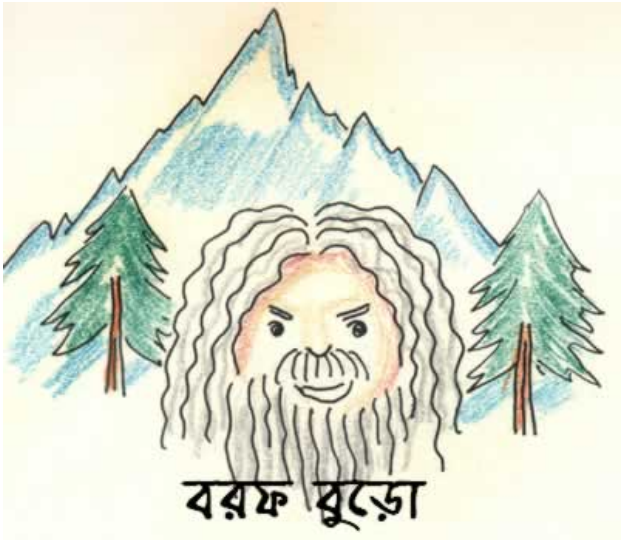

আসলে এক বরফ বুড়ো
থাকে ঝাউয়ের বনে
বরফ ঢাকা পাহাড় চুড়োয়
থাকে মেঘের কোনে
ঝুপ করে শীত নামলে পড়ে
চুপ করে সে শোনে
উলের টুপি মাথায় দিয়ে
শীতের প্রহর গোনে।

যখন আসে বসন্ত সে
ফুলের রেণু মাখে
বুড়ো তো নয় ছোট্টো খোকা
সবাই তাকে ডাকে।

বর্ষা হলেই একলা ভেজে
নিজের কাপড় শুকোয় নিজে
গ্রীষ্ম এলেই ছাতা মাথায়
দাঁড়িয়ে সে ঠিক থাকে।

সারা বছর দুষ্টুমি তার
বিচিত্র তার খেলা
ফুঁ দিয়ে মেঘ জড়ো করে
বানায় মেঘের ভেলা
সেই ভেলাতেই ঘুরতে
বেরোয় কম করে দুই বেলা

সঙ্গে থাকে চাঁদের বুড়ি
যায় না তারা দীঘা পুরী
ছায়াপথে বেড়িয়ে দুজন
দেখে তারার মেলা।।

দ্বৈতা গোস্বামী
গুরগাঁও, হরিয়ানা

প্রকৃতির ধর্ম

একদিন ইস্কুলে গিয়ে দেখে অর্ক
দুইদলে বেধে গেছে বড় জোর তর্ক;
তর্কের কেন্দ্রে ছিলো শীত গ্রীষ্ম
তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ভয়ানক দৃশ্য।

গ্রীষ্মের বিরুদ্ধে ছিল এই যুক্তি
হাসফাঁস করা থেকে নেই কোনো মুক্তি;
খাদ্যেও সুখ নেই খেয়ে নেই স্বস্তি
খেয়ে পরে বসে শুয়ে শীতে সুখ অস্তি।

হাড় কাঁপা ঠান্ডায় ভোরে ওঠা শক্ত
বাইরে গেলেই যেন জমে যায় রক্ত;
হাত পায়ে টান ধরে খস খস গাত্র
টের পাবে হাড়ে হাড়ে জলে নামা মাত্র।

কাঁঠালের দেশে পাবে আম জাম বিল্ব
রসে ভরা ফলগুলি গরমেতেই মিললো;
সরবতে স্বাদ পাবে,সুখ দেবে লস্যি
বাসনা তৃপ্ত হবে হও যত দস্যি!

শীতকালে পাবে তুমি যত শাক সব্জি
পেট ভরে খেতে পার ডুবিয়ে ঐ কব্জি;
খেজুরের রসে পাবে নলেনের সন্দেশ
পার্বণী পিঠা পাবে খেতে পার কমবেশ।

সবদিক শুনে বুঝে হেঁকে বলে অর্ক
খুব হলো থামো দেখি থামাও বিতর্ক;
শীতকালে শীত ভালো গ্রীষ্মে ঘর্ম
সমতালে তাল রাখা প্রকৃতির ধর্ম।

জামাল ভড়
বারাসাত
উত্তর চব্বিশ পরগনা

বন্ধু পাতানো

ফুরুত ফারুত উড়ছে চড়ুই
বসছে গাছের মগডালে,
'এ্যাই পাখিটা, করছোটা কি
পড়া ফেলে সক্কালে!

তোমায় বুঝি মা বকে না
করতে হয় না হোমটাস্ক,
আন্টি বুঝি এমনি এমনিই
দিয়ে দেয় ফুল-মার্কস্!

তোমার তো ভাই ভারি মজা
খেলে বেড়াও সারাটা দিন!
আমার তুমি বন্ধু হবে?
খেলবো দু'জন ছুটির দিন।'

সুমন কুমার নায়েক
বোলপুর, বীরভূম

গল্প-স্বল্প

সরল ও হাতি

সরল এখন খুব খুশি। কারণ সরল ইশকুলে ভর্তি হয়েছে। বাবু সরলকে ইশকুলে যেতে দিতে চায় নি, ক্ষেতের কাজে সরল আজকাল বেশ পোক্ত হয়েছে যে। কিন্তু পঞ্চায়েত থেকে বলেছে সব ছেলেমেয়েকে ইশকুলে পাঠাতেই হবে। ইশকুলের মাইনে, বইখাতা সব নাকি গরমেন্ট দেবে। দুপুর হলে পেট ভরে খিচুড়ি খেতেও দেবে। সেই শুনে বাবু রাজি হয়েছে। এমনিতে তো সরল সেই ছোট্ট থেকে সকাল হলেই বাবুর সঙ্গে আর দাদাদের সঙ্গে ক্ষেতের কাজ করতে যায়। দুপুরে একবার বাড়ি এসে বাবুর জন্যে, দাদাদের জন্যে ভাত নিয়ে যায়। ক্ষেতের কাজে ভারি মজা। শুকনো মাটিতে নিড়ানি দাও, শুকনো পাতা মাথায় করে ফেলে এসো, ঝারি করে জল নিয়ে গাছকে চান করিয়ে দাও। দু'সন ভালো ধান হয় নি। সে নিয়ে গাঁয়ের সবাই খুব ভাবনা করেছিল। এবছর ভালো বৃষ্টি হয়েছে, তাই এমনিও বাবুর মেজাজ ভালো আছে। প্রথমে রাজি না হলেও সব শুনে টুনে বলল, 'আচ্ছা, সরল ক'বছর ইশকুলে যাক না হয়। একজনের একবেলার খাওয়াটাও হবে।'

গরমেন্ট কে সরল জানে না। কিন্তু মনে মনে গরমেন্টকে প্রণাম করেছে সরল। গরমেন্ট নিশ্চয় একজন খুব ভালো লোক। তাই তো সরলের ইশকুলে যাবার সাধ মিটল।

মাঝিপাড়ার পবন, গুলু, সোরেন আগেই ইশকুলে যাওয়া শুরু করেছে। সরলদের পাড়া থেকে সরল আর গণেশ ওদের সঙ্গেই চলে যাবে, বাবু বলে দিল। জেলেপাড়া নামোপাড়া থেকেও ক'জন ছেলে আছে।

আট-দশজনের একটা দল। ইশকুল অনেক দূর। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আট দশ মাইল গেলে পাকা সড়ক। হাইওয়ে বলে সড়কটাকে, এখন জানে সরল। সেই হাইওয়ে ধরে আরো দু'মাইল প্রায়। তারপর দূর থেকে ইশকুল বাড়ি দেখা যায়।

ইশকুলটা একটা ছোট পাহাড়ের ওপর। পাহাড়ের ঢালুতে একটা মস্ত জারুল গাছ। তার ঠিক পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে রাস্তা চলে গেছে, একেবারে ইশকুলের ফটক পর্যন্ত। ফটকের পাশে খেলার মাঠ, তার ওপর বালি ছড়ানো। আর ফটক দিয়ে ঢুকলেই ফুলের বাগান। লাল নীল হলুদ বেগুনী ফুলে ঝলমলে বাগানটায় ঢুকলেই সরলের মন ভালো হয়ে যায়।

যাওয়ার গোটা পথটা মন ভালো করা। জঙ্গলের মধ্যে রোদ ঢোকে না, ছায়া ছায়া রাস্তা ধরে দৌড়ে দৌড়ে যায় সবাই মিলে। হলুদ সবুজ কত প্রজাপতি, বনের গাছে গাছে কত পাখির ডাক। গাছের পাতায় নানারকম সবুজ, হালকা সবুজ, ঘন সবুজ, হলুদ ছোপ ছোপ সবুজ, কালচে সবুজ। জোরে জোরে বাতাস বয়, রাশি রাশি পাতা গাছ থেকে টুপটাপ পড়তে থাকে মাথায়, মুখে। সবাই মিলে খোলা গলায় হাসে। বেশি জোরে হাসা, কথা বলা বারণ। বনদেবতা রাগ করবেন।

বনের মধ্যে এক জায়গায় খোলা একটুখানি জায়গা আছে। সেখানে রোজ সরলরা একটুক্ষণ বসে। ঠিক মুখোমুখি একটা লেবুগাছ, তার পাতার নিচে মস্ত আটকোণা মাকড়সার জাল। সেই জালে রোদ্দুর পড়ে কেমন সোনালি চিকচিকে রঙ হয়, সেইটা রোজ দেখে সরল। খুদে খুদে জানোয়াররা ঘুরে বেড়ায়, মেঠো ইঁদুরগুলো সরলদের দেখে লুকিয়ে পড়ে। একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার হাঁটে সরলরা।
পাকা রাস্তায় ওঠার ঠিক আগে একটা বড় শিমুল গাছ। সেই গাছটার ডালে বোলতারা মেটে রঙের মস্ত চাক বেঁধেছিল। গণেশের বড়জ্যাঠা একদিন বাঁশের আগায় মশাল বেঁধে সেই চাকে আগুন ধরিয়ে দিল। জ্বলতে জ্বলতে চাকটা মাটিতে পড়ল, আর কত কত বোলতা সেই আগুনে পুড়তে লাগল, রাগে আওয়াজ করতে করতে চারদিকে উড়তে লাগল। সরলদের সবার হাতে বড় বড় পাতাসুদ্ধ ডাল ধরিয়ে দিয়েছিল জ্যাঠা আগেই। ওরা সমানে সেই পাতাগুলো নিজেদের চারদিকে ঘোরাচ্ছিল। নইলে বোলতার হুল। বাব্বা! ফুলে ঢোল হয়ে যাবে, সেই সঙ্গে ব্যথা। সেই চাকভাঙা মধু নিয়ে সন্ধেবেলা সরলদের পাড়ায় কত হুল্লোড় হল।

দুদিন ধরে সরলদের গ্রাম থেকে কেউ ইশকুলে যাচ্ছে না। একটা বুনো হাতি এসেছে। কদিন আগে সরলদের পাশের ক্ষেতে এসে সব ধান খেয়ে চলে গেছে। প্রতিবছরই হাতি এসে ফসল খেয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু হাতিদের আসার সঙ্গে গ্রামবাসীদের একটা অলিখিত বোঝাপড়া আছে। পরবের আগে কোনোদিন এ গ্রামে হাতি আসে নি। এবার হাতি শুধু আগে আগে আসে নি, প্রায় আট দশজনের ক্ষেতের ধান নষ্ট করেছে, ধান খেয়েছে, রাগে ক্ষেত মাড়িয়ে দিয়েছে।

খবর পেয়ে তীরধনুক, মশাল, ক্যানেস্তারা, পটকা নিয়ে ছুটে গেল সবাই। তখন হাতি পালিয়ে গেল। কি রাগ, কি ভয়ানক চিৎকার, গোদা গোদা পায়ে সব ধান মাড়িয়ে দিয়ে চলে গেল।

কি ভাগ্যি, সরলদের ক্ষেতের ধানে সেদিন পা পড়ে নি হাতির। সেই থেকে সারাদিন ধরে, সারারাত জেগে গ্রামসুদ্ধ লোক ক্ষেত পাহারা দিচ্ছে। মশালের আগুনে হাতি ভয় পায়, পটকার আওয়াজেও ভয় পেয়ে পালায়। শুধু একদিন ক্যানেস্তারা বাজাতে বাজাতে সিধুজ্যাঠা বনের কাছ পর্যন্ত চলে গেছিল, সেদিন হাতিটা রেগে গিয়ে সিধুজ্যাঠাকে তাড়া করেছিল। আর একদিন পবনের ছোট ভাইটাকে শুঁড়ে

তুলে আছাড় দিয়েছিল, ভাগ্য ভালো প্রাণে বেঁচে গেছে, হাত ভেঙে পিঠের হাড় ভেঁঙে সদরের হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

সবাই বলছে, 'হাতিটা পাগলা হয়ে গেছে।'

পঞ্চায়েত অফিস থেকে কেরোসিন দিয়েছে, পটকা দিয়েছে। গাঁয়ের লোক গিয়ে বনদপ্তরে হাতির নামে নালিশ লিখিয়ে এসেছে। কিন্তু এখনও পাগলা হাতিকে ধরা যায় নি। ফরেস্টার বাবুরা এসে বন্দুক নিয়ে আকাশে গুলি ছুঁড়ে, ক্যানেস্তারা বাজিয়ে হাতি খেদিয়ে দূরের জঙ্গলে পাঠিয়ে দিয়ে যায়। কোথায় লুকিয়ে থাকে হাতি কে জানে, ফরেস্টারবাবুরা চলে গেলেই এসে গাঁয়ে ঢোকার রাস্তার মুখের অর্জুনগাছের ডাল ভেঙে দিয়ে যায়। খুব বুদ্ধি হাতির। মুন্ডাপাড়ার দিকে লোকজন পাহারা দিচ্ছে, হাতি মাঝিপাড়ার দিক দিয়ে এসে তান্ডব করে যায়।

কদিন আগে কার্তিকদের ঘরের চাল উপড়ে দিয়ে গেছে। একদিন রাস্তার ওপর একটা গরুর গাড়ি উলটে দিয়েছে। দিন নেই, রাত নেই, কখন হাতি আসবে সেই ভয়ে গ্রামসুদ্ধ লোক অস্থির। ছোট বাচ্চারা পর্যন্ত বাড়ির বাইরে বেরোতে ভয় পাচ্ছে। মুখে মুখে গল্প ঘুরছে। সেই যেবার বাদনা পরবের পরে মাঝিপাড়ার অমন জোয়ান ছেলেটাকে হাতি মেরে ফেলেছিল। এই তো গত বছর পাশের গাঁয়ের মোহন টুডুর একমাত্র কচি ছেলেটাকে শুঁড়ে করে আছড়ে মেরে ফেলেছিল।

দেখেশুনে গাঁয়ের সবাই ঠিক করেছে, এখন আর সরলদের ইশকুলে গিয়ে কাজ নেই। কখন হাতি তাড়া করবে কে জানে। বুনো হাতি এমনিই ভয়ঙ্কর, তার ওপর এ হল পাগলা হাতি। একেবারে মাড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে।

ইশকুলে যাওয়া হচ্ছে না বলে সরলের খুব মনখারাপ। কত মজা হয় ইশকুলে। গরমেন্ট শুধু বইখাতা দেয় নি, ড্রয়িংবই ড্রয়িংখাতা আর রঙপেন্সিলও দিয়েছে। সেই খাতায় ইশকুলে বসে কত ছবি আঁকে সরল। বাড়িতে বসে বসে এত ছবি এঁকেছে সরল যে ড্রয়িংখাতার সব পাতা শেষ। ইশকুলে গেলে তবেই তো আর একটা ড্রয়িংখাতা পাবে!

তাছাড়া ভূগোল ক্লাসটার জন্যেও মনখারাপ করে। ভূগোল সবচেয়ে ভালো লাগে সরলের। মাস্টারমশাই কি সুন্দর দেশ বিদেশের গল্প বলেন। একটা লম্বা রঙচঙে কাগজ দেখিয়ে যেদিন বলেছিলেন, 'এই দ্যাখ, এইটা হল আমাদের দেশ'; সেদিনের কথাটা স্পষ্ট মনে আছে সরলের। দেশ মানে ভারত, সেইটা আগে থেকেই জানত। কিন্তু ভারত যে ওই কাগজটাকে বলে সেইটা জেনে তো সরল অবাক। তারপর মাস্টারমশাই বললেন, 'এইটাকে মানচিত্র বলে।' সেই মানচিত্রে নাকি ভারতের সব জায়গার নাম আছে। একেবারে ডান দিকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এই যে এইটা গঙ্গা, এই হল আমাদের পশ্চিমবঙ্গ .. আর এই দ্যাখো পুরুলিয়া, এইখানেই আমাদের কুলহি গ্রাম।'

অনেক খুঁজেও কুলহি নাম দেখতে পায় নি সরল, তখন মাস্টারমশাই বুঝিয়েছিলেন, কাছাকাছি কোনো বড় জায়গার নাম দিয়ে বুঝতে হবে। সব ছোট ছোট জায়গার নাম তো থাকে না, শুধু রাজধানী বা বড় শহরের নাম থাকে। আর কোনো জায়গায় যদি কোনো দর্শনীয় জিনিস থাকে কিংবা কোনো স্মরণীয় ঘটনা ঘটে, তাহলে সেই জায়গার নাম থাকে।

ইস, সরলদের গ্রামে যদি একটা স্মরণীয় ঘটনা হত!

আর এখন তো ইশকুলেই যাওয়া হচ্ছে না। খুব মনখারাপ করে সরলের।

সাত দিনেও কোনো সুরাহা হল না। আজ সকালে ক্ষেতে যাবার নাম করে বেরিয়েছে সরল। গাঁয়ের সব পুরুষমানুষ হয় ক্ষেতের কাছে নয় বনের দিকে পাহারায়। নদীর দিক দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সরল। রাস্তা তো চেনাই আছে। পলাশ গাছটার পাশ দিয়ে জঙ্গলের রাস্তায় ঢুকে পড়বে। হাতি এলে কোথায় লুকিয়ে পড়বে তাও ঠিক করে নিয়েছে মনে মনে। যেমন করেই হোক, আজ ইশকুলে যাবেই।

বনের মধ্যে দিয়ে অনেকখানি এক ছুটে পেরিয়ে এসে মাকড়সার জালের কাছে এসে বসল সরল। আর একটুখানি। ওই আমলকি গাছটার পাশ দিয়ে গেলেই একটা জলা, জলা পেরোলেই শালগাছের বন, সেইটা পেরোলেই শিমুলগাছ। তারপরেই বড় রাস্তা। জলার কাছ পর্যন্ত ভালোভাবেই পেরিয়ে এল। তারপরই থমকে দাঁড়িয়েছে। কালো পাহাড়ের মতো বড় হাতিটা। জল খেতে এসেছিল নিশ্চয়। জল খেয়ে হাতিদের নুন খেতে হয়। হাতিটা জলার পাশের মাটি চাটছে। সরল জানে, ওটা নোনা মাটি। ওই জলায় জল খেয়ে সব ছোট বড় জানোয়ার মাটি চাটে। পাগলা হাতি মাটি চাটায় ব্যস্ত, সরলকে দেখতে পায় নি।

পাশেই একটা বুড়ো মস্তবড় শিশু গাছ। একটুও আওয়াজ না করে সরল তরতর করে শিশু গাছে উঠে গেল। একটা পাতাওয়ালা ডাল দেখে লুকিয়ে বসল তারপর। সেইটুকু আওয়াজেই হাতি মুখ তুলে তাকিয়েছে, ভাগ্যিস সরলকে দেখতে পায় নি। তবু কি ভেবে হাতিটা এগিয়ে এসে শিশুগাছে খুব জোরে ধাক্কা দিয়ে গেল। গাছের ডাল আঁকড়ে বসে রইল সরল।

হাতি চলে যাবার পরও নামে নি। যদি হাতিটা আবার ফিরে আসে। পাগলা হাতি পলকে শুঁড়ে তুলে আছাড় দেবে।

দেখতে দেখতে বেলা কাটল আরো। হাতি কাছাকাছিই আছে। মাঝেমাঝেই গাছপালার ফাঁক দিয়ে কালো শরীর দেখা যাচ্ছে। কতক্ষণ সময় কাটল কে জানে। সেই সকালে বেরিয়েছে সরল, সূর্য এখন মাথার ওপর। খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে। শিশুগাছে না উঠে পাশের মহুয়া গাছটায় উঠলে ভালো হত। ছোট

ছোট ফলে ও গাছটা ভরে আছে। তখন অত দিকে খেয়াল হয় নি।

সরলের একটু একটু ভয় করছে। এমনিতে গাঁয়ের লোকজন এ রাস্তায় আসে, কিন্তু এখন হাতির ভয়ে কেউ আসছে না। কেউ যদি না আসে! বাড়ি ফিরবে কি করে!

পাশের ডালে খুব ছোট একটা হনুমান, গায়ে একটু একটু লোম, কুচকুচে মুখ, পিটপিট করে তাকিয়ে কুঁইকুঁই করে বকতে লাগল সরলকে। যেন বলছে, 'এটা আমার বাড়ি, তুই এখানে কেন?'

আওয়াজ শুনে হাতিটা না ফিরে আসে। সরল চোখ পাকিয়ে তাকালো। তাতে রেগে গিয়ে হনুমানটা ভেংচি কেটে দিল। খানিক পরে একটা বড় হনুমান এসে ছোট হনুমান্টাকে মুখে করে তুলে নিয়ে গেল।

যাক বাবা। মা-হনুমানটা ভাগ্যিস রাগ করে নি!

আরো খানিকক্ষণ পরে কালো শরীরটার নড়াচড়া দেখতে পেল সরল। কি একটা টেনে আনছে হাতিটা। একটু করে আসছে, আর দাঁড়িয়ে পড়ে চিৎকার করছে। সে কি চিৎকার। ভয়ে সরলের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। হাতিটা খুব রেগে আছে। কি হবে এবার?

একবার মহুয়া গাছের ডালটা হাওয়ায় সরে যেতেই হাতিটাকে দেখতে পেল। একটা বাচ্চা হাতিকে টেনে আনছে। মা-হাতি একটু করে টেনে আনছে, আর বাচ্চা-হাতিটা বেজায় চিৎকার করছে। সেই শুনে মা-হাতি আরো জোরে চিৎকার করছে। বাচ্চা-হাতির পায়ে লেগেছে বোধ হয়, চলতেই পারছে না। আহা রে, ওর পা ভেঙে গেছে।

এবার বুঝেছে সরল। মা-হাতিটা মোটেই পাগল নয়। বাচ্চার পায়ে লেগেছে বলে ওরা দুজনে দল থেকে আলাদা হয়ে গেছে। দলের সঙ্গে হেঁটে যেতে পারে নি। কেউ কাছে এলেই মা-হাতি ভাবে ওর বাচ্চাকে মারতে আসছে বুঝি, তাই তেড়ে যায়। বোধহয় সরলদের গ্রামের কাছেই ছিল এতদিন, তাই গ্রামে ঢুকে তান্ডব করত যাতে কেউ ওদিকে না যায়। হাতি খেদানোর দল এলে তাই হাতি তাড়া করত।

মা-হাতি বাচ্চাকে নিয়ে ব্যস্ত আছে, সেই ফাঁকে আস্তে গাছ থেকে নেমে পড়ল সরল। তারপর এক ছুটে গ্রামে। গ্রামের লায়াবুড়ো অনেকরকম ওষুধ জানে। দিকুমাঝির ঠাকুমাও জড়ি বুটি দিয়ে অনেক রোগ সারায়। তারপর বাবুকে রাজি করিয়ে গ্রামের লোকজনকে বুঝিয়ে আনা কম ঝক্কি!

চুপি চুপি গাছের আড়াল দিয়ে হাতির কাছ পর্যন্ত পৌঁছবার আগে হাতিও টের পায়নি।

কাছে গিয়েই সরল মা-হাতিটার পিঠে চড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে শুরু করল। লায়াবুড়ো আর ঠাকুমা ওষুধ নিয়ে বাচ্চা-হাতির পায়ে লাগাতে বসল। ওষুধ দিয়ে মোটা কাপড় দিয়ে বাঁধা, একটু একটু করে পাতলা ওষুধ খাওয়ানো, অনেক সময় লাগল। বাচ্চা-হাতি প্রথমে ছটফট করছিল, একটু পরে শান্ত হয়ে মাথাটা মাটিতে নামিয়ে রাখল। বাবু মাথাটা কোলে নিয়ে বসল। মা-হাতি কি বুঝল কে জানে, কাউকে তেড়ে গেল না, চিৎকারও করল না, বরং চোখ বুজে সরলের আদর খেতে লাগল।

লোকজন মিলে বাচ্চা-হাতিকে তুলে গ্রামে নিয়ে আসা হল। মা-হাতি সরলকে পিঠে নিয়ে শান্ত হয়ে গ্রাম পর্যন্ত এল। কতদিন ধরে বাচ্চা-হাতি ওদের গাঁয়েই থাকল তারপর। মা-হাতি জঙ্গলে থাকত, আর রোজ একবার এসে বাচ্চাকে দেখে যেত। একদিনও ক্ষেত মাড়ায় নি, কাউকে ভয় দেখায় নি।

এদিকে আর এক কান্ড। ইশকুলে গিয়ে সরলরা যখন হাতির গল্পটা বলেছে, প্রথমে তো কেউ বিশ্বাসই করে না। তারপর মাস্টারমশাইরা ডেকে ডেকে গল্পটা শুনতে চাইলেন। হেডমাস্টারমশাইও ওদের ডেকে সব শুনলেন। কি থেকে কি হল কে জানে, একদিন টিভি থেকে খবরের কাগজ থেকে কত লোক কত ক্যামেরা সরলদের গ্রামে এসে হাজির। বাচ্চা-হাতির কত ছবি তুলল তারা। সরলের সঙ্গে বাচ্চা-হাতির ছবি তুলল। মুখের সামনে মাইক ধরে ধরে সরলের গল্পটা বলতে বলল।

তারপর আরো এক কান্ড।

হেডমাস্টারমশাই বাবুকে আর সরলকে সদরের বড় অফিসে নিয়ে গেলেন। সরল সাহসিকতার পুরষ্কার পাবে। সদরের অফিসের সবাই এসে বাবুকে আর সরলকে দেখতে লাগল। সরলের দিল্লী যাবার সব ব্যবস্থা হল। বাবু ভয়ে দিল্লী যেতেই চাইল না। তখন হেডমাস্টারমশাই সরলকে নিয়ে দিল্লী গেলেন। বড়দাদাও সঙ্গে গেল।

সরলের এই প্রথম ট্রেনে চাপা।

তারপর রাষ্ট্রপতির হাত থেকে যেদিন পুরষ্কার পেল, সেদিনটার কথা কোনোদিন ভুলবে না সরল। রাষ্ট্রপতি মিষ্টি হেসে সরলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, হোটেলের ঘরে বসে সেই ছবিটা টিভিতেও দেখেছে। কত হাততালি। কত বাজনা। কত ছবি তোলা। সব স্বপ্নের মতো ব্যাপার স্যাপার। দেখতে দেখতে সরলের মাথায় একটা কথা এল। এই যে ঘটনাটা ঘটল, এটাকে কি স্মরণীয় ঘটনা বলা হবে? ভারতের মানচিত্রে কি বেরাপোতা গ্রামের নাম উঠবে? কিংবা সরলের ইশকুলের গ্রাম কুলহির নাম? বড়দাদা তো কথাটা বুঝতেই পারল না, হেডমাস্টারমশাই শুনে এমন হাসতে লাগলেন যে আর কিছু জবাব দিতেই পারলেন না।

গ্রামে ফিরেও অনেকদিন এমন মজা আর আনন্দে কাটল।

তারপর একদিন মা-হাতি বাচ্চা-হাতিকে নিয়ে জঙ্গলে ফিরে গেল। গ্রামের সব ছোট ছেলেমেয়ে খুব কাঁদল, মা জ্যেঠিরা মা-হাতিকে সিঁদুর পরিয়ে দিল, বাচ্চা-হাতিকে সাদা টিপ পরিয়ে দিল। সরলেরও খুব কান্না পাচ্ছিল। আর একটা কথা নিজে নিজেই বুঝে ফেলল সরল। মানচিত্রে স্মরণীয় না-ই হোক, সরলের কাছে এই ঘটনাটা সারা জীবনের জন্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সরল বইয়ে পড়েছে, হাতিদের স্মৃতিশক্তি খুব ভালো, মানুষের থেকেও বেশি। তাই সরল জানে, হাতিরাও এই ঘটনাটা মনে রাখবে। সরল হাসিমুখে মনখারাপের চোখের জল মুছে নিল।

আইভি চ্যাটার্জি
জামশেদপুর, ঝাড়খন্ড

অলংকরনঃ
কৌস্তভ রায়
আহমেদাবাদ, গুজরাত

আবিষ্কার

১

' টুবলু, টুবলু, টুবলু উ উ উ '
মার গলা, অনেকক্ষন ধরেই শুনতে পাচ্ছি। যাচ্ছি না ইচ্ছে করেই, মনে হচ্ছে এই বার না গেলে মার খাব। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলাম।

'একি অবস্থা করেছিস তুই?'

আমি নিজের দিকে তাকালাম। লাল হাফ প্যান্ট আর সবুজ গেঞ্জিতে মাটি মেখে একাকার। পায়ের মাটি তাজা। ঘরের মেছেতে ছোপছোপ দাগ। হাতের মাটি শুকিয়ে খড়খড় করছে।

'এই মাত্র পরিষ্কার জামাকাপড় পরে খেলতে গেলি, আর এর মধ্যে এত মাটি কোথা থেকে এল?'

'বাগান করছিলাম।'

'বাগান করছিলি? এই কি তার নমুনা? বাগান করলে এ রকম হয় কখনো? ঠিকঠিক বল কি করছিলি?

মাকে বলা যাবে না ঠিক কি করছিলাম। চুপ করে দাড়িয়ে রইলাম। ক'দিন আগে পিন্টুদের বাড়ি গিয়ে ছিলাম। ওদের দোতালায় একটা ঘর পুরোপুরি হতে এখন বাকি। তার মেঝেতে বালি ছিল এক ঢিপি। বালিটা বৃষ্টিতে ভিজে গেচ্ছিল। তার থেকে পিন্টু একটা বালির শহর করেছিল, মিশরের মত। নাম দিয়েছিল মিশর সভ্যতা। আমি ভুল করে পা রেখে দিয়েছিলাম আর ভেঙে যায় কিছুটা। ও তারপরে আর ঐ জায়গাটা ঠিক করে উঠতে পারেনি। আমার ওপরে খুব রেগে গিয়েছিল। কয়েকদিন তো কথাই বলেনি। তখন আমি মনে মনে ঠিক করেছিলাম যে ওকে আমি মিশর সভ্যতা নতুন করে বানিয়ে দেবো

'কিরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বল কি করেছিলি?'

' আমি মিশর সভ্যতা করার চেষ্টা করছিলাম।'

'মিশর সভ্যতা, বাগানে?'

' হ্যাঁ ; পিন্টু করেছিল আগে, ওদের বাড়িতে। আমাকে বলেছিল যে বালি ভিজিয়ে নাকি মিশর সভ্যতার মত শহর করা যায়।'

' তারপর?'

'আমাদের বাড়ির বাগানের কোনে যে বালির ঢিপিটা আছে তার ওপর জল ঢেলে ভেজানোর চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু ভিজছে না। কোথায় যেন চলে যাচ্ছে সব জল। আঠের বালতি জল ঢালার পর দেখি একটুও ভেজেনি। ভাবছিলাম কি করব। তখন তুমি ডাকলে।"

'ওফফ, তোকে নিয়ে আর পারি না। বালি কি কখন ওরকম করে ভেজে নাকি? কিন্তু জল, জল কোথা থেকে নিলি? এই রে সর্বনাশ, ড্রামের জল শেষ করেছিস নাকি?'

'না, না, কল থেকে বালতি করে নিয়ে গেছি।'

'বাঁচালি। বা, বাহ।' মা যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। 'দূর বোকা তুইও যেমন, বালি কি ওরকম করে ভেজান যায় নাকি?। যা যা, বাথরুম গিয়ে সব ছেড়ে পরিষ্কার হয়ে করে আয়। অনেক খেলা হয়েছে তোর আজকের মত। এবার পড়তে বোস।'

কি আর করা। হাত মুখ ধুয়ে, পরিষ্কার করে পড়তে বসতে হল। কিন্তু আজ পড়ায় মন বসছে না। পিন্টুর সাথে শিগগিরি এই নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

২

'বুঝলি পিন্টু, মিশর সভ্যতা আর হল না।'

'হুমম'

ও কিছু বলল না। আমরা দুজন ফুটবল খেলার শেষে মাঠের এক কোনে বসে আছি। খেলার শেষে রোজই থাকি কিছুক্ষন। তবে খেলা যদি জমে যায় বা দু-চারটে গোল হয়, তাহলে অন্যরাও থাকে। আজকে খেলা জমেনি। এমনিতেই ফুটবলটা আমার চেয়ে ও খেলে ভাল। তার ওপর আজকে আমি খেলেছি খুবই বাজে, একটা গোল তো আমার জন্যই খেয়েছি। ও খেলার জন্য চুপ করে রয়েছে না মিশর সভ্যতার জন্য সেটা ঠিক বুঝলাম না।

'আমি সেদিন বাড়িতে অত চেষ্টা করলাম, হলই না'। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে।"

ও আমার দিকে ফিরে বলল, 'তবে আমরা ইট দিয়ে চেষ্টা করতে পারি'

'ইট না হয় কয়েকটা জোগাড় করে নেব। কিন্তু গাঁথব কি দিয়ে? সিমেন্ট তো আর আমরা পাবনা, আর কেউ দেবেও না।'

'হুমম', এই বলে ও গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়ল। "তার মানে এই খেলাটা আর তেমন জমবে না। অন্য কিছু ভাবতে হবে।'

'আচ্ছা, আমরা আবিষ্কারক হলে কেমন হয়? আমি কয়েকদিন ধরে প্রোফেসর শঙ্কুর গল্পের বই পড়ছি। তাই থেকে এই আইডিয়াটা পেয়েছি, বুঝলি উনি না অনেক কিছু আবিষ্কার করেন, সারা পৃথিবী জোড়া নামডাক-'

'আমি তেমন পড়িনি, তা কি কি আবিষ্কার করেন বল দেখি?'

পিন্টু চিরকালই গল্পের বই পড়ে কম। এ ব্যাপারে ওর মাস্টার হচ্ছি আমি। বেশ উৎসাহ নিয়ে বলতে শুরু করলাম। কারন ইতিমধ্যে আমি মনে মনে প্রোফেসর শঙ্কুর বিরাট বড় ভক্ত হয়ে উঠেছি। 'ও বাবা, সে অনেক কিছু। রোবট তৈরী করেন। অদৃশ্য হওয়ার ওষুধ, বন্দুক পিস্তল, মহাকাশযান কত কি।'

'বাহ ভাল তো, কিন্তু আমরা কি আবিষ্কার করব?'

'করব, কিন্তু তার আগে আমাদের একটা ল্যাবরেটরি গড়ে তুলতে হবে। বড় বড় বিজ্ঞানীরা সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে। আমাদের ও সবকিছু নিজেদেরই জোগাড় করে নিতে হবে।'

'ঠিক আছে, কিন্তু কিভাবে শুরু করব ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আরে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা আগে একটা লিস্ট করে নেব কি কি লাগবে আর কি কি আমাদের আছে। তারপরে একটা নোটবই করতে হবে, আর সবকিছু লিখে রাখতে হবে। প্রোফেসর শঙ্কুও সব লিখে রাখেন।'

সন্ধ্যে হয়ে আসছিল। আমরা উঠে পড়লাম। নতুন কোন উদ্যোগ নিলে ফূর্তির আর সীমা থাকে না। আজকেও আমরা বেশ লাফাতে লাফাতেই বাড়ির দিকে রওনা দিলাম। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ল্যাবরেটরির ফর্দটা করে নিতে হবে। আর কোথায় ল্যাবরেটরি হবে সেটাও ঠিক করে নিতে হবে।

৩

কয়েকদিন পরে দেখা গেল বেশীরভাগ জিনিসই জোগাড় করা যাচ্ছে না। আমাদের ল্যাবরেটরির ব্যাপারটাকে বড়রা তেমন পাত্তাও দিল না কেউ। নিদেন পক্ষে দাদা-দিদিরাও না। লিস্টের থেকে অনেক কিছুই বাদ গেল। যে আগুন ছাড়া প্রায় কোন কিছুই আবিষ্কার প্রায় অসম্ভব, সেই দেশলাইটাই পাওয়া গেলনা। শেষমেশ লিস্টটা দাঁড়াল এইরকম।

(১) আতশ কাঁচ - আছে, এবং দুটো। আমাকে বাবা একটা মেলা থেকে কিনে দিয়েছিল। সবুজ রঙের। আর পিন্টুরটা কালো আর বড়। ওটা বেশ পুরনো।

(২) চুম্বক - আছে, কিন্তু এটা আমার কাছে নেই আছে ওর কাছে। ওদের বাড়িতে কিছুদিন আগে একটা পুরনো রেডিও খারাপ হয়ে গেছিল। পিন্টু ওর দাদার কাছ থেকে শুনে স্পীকার ভেঙে চুম্বক জোগাড় করেছে। আমি শুনেছিলাম চুম্বককে ঝুলিয়ে দিলে নাকি উত্তর-দক্ষিন দিকে মুখ করে থাকে। এটা থেকে অবশ্য তেমন বোঝার উপায় নেই। কারন এটা গোল, কোনটা উত্তর, কোনটা দক্ষিন বোঝার উপায় নেই। তবে অসুবিধে নেই। শুনেছি চুম্বক নাকি তৈরী করে নেওয়া যায়।

(৩) কাঁচি - মার একটা পুরনো কাঁচি আমাকে দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তাই দিয়ে কাগজ দিব্যি কাটা যাচ্ছে।

(৪) ছিপ - এটা জানি না বিজ্ঞানের কোন কাজে লাগবে। তবে পিন্টুদের বাড়ি নাকি কোন কালে একটা খুব ভাল ছিপ ছিল। ও সেই ছিপের হুইল'টা ল্যাবরেটরির জন্য খুলে নিয়ে এসেছে।

(৫) নোটবই - এটা বাবা আমাকে দিয়েছে। সব লেখা থাকবে এখানে।

আমরা বসেছিলাম আমাদের এক গোপন আস্তানায়। এটা নতুন। আমাদের গোপন ঘাঁটি কিছুদিন পরে পরেই জানাজানি হয়ে যায়। তখন আমরা আবার নতুন ঘাঁটি খুঁজে নিই। আমাদের আগের জায়গাটা দিব্যি ছিল। কেউ জানতেও পারেনি। কিন্তু সেখানে হঠাৎ এক বোলতার চাক হয়েছে বলে আমরা একটু খোলামেলা জায়গায় এসেছি এবার। আমাদের পাড়ায় একটা বাড়ি তৈরী হচ্ছিল কিন্তু কোন কারনে অর্ধেক হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। ছাদ ঢালাই হয়েছে, মেঝে হয়নি। ইটগুলো দাঁত বার করে বসে আছে। আমি কাগজ কেটে একটু অন্য ধরনের এরোপ্লেন বানান যায় কিনা সেই চেষ্টা করছিলাম। আমি দুরকম জানি। একটা খুব সহজে তৈরী করা যায়, সেটা হচ্ছে জেট। আর অন্যটা একটু শক্ত, তবে ওড়ে বেশ।

পিন্টু আতশ কাঁচ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ও নাকি শুনেছে যে ঐ কাঁচ দিয়ে নাকি আগুন ধরান যায়। কি জানি কি করে। মনে হয় সেই চেষ্টাই করছিল। হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠল।

'কি রে কি হল?'

'আইডিয়া, মাটি খুড়লে কেমন হয়?'

'মাটি? কেন?'

পিন্টু অধৈর্যের মত ছটফট করে বলল, "ওফফ তুই কিচ্ছু বুঝিস না। মাটি খুঁড়েও তো কত কিছু আবিষ্কার করা যেতে পারে। আগে কত লোক গুপ্তধন পেয়েছে মাটি খুঁড়ে। প্রাচীন সভ্যতা ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে মাটি খুঁড়েই। পুরনো দিনের কত কিছু। আমরাও তো কিছু একটা পেয়ে যেতে পারি' যেমন কথা তেমন কাজ। সঙ্গে সঙ্গে আমরা খালি হাতেই মাটি খুঁড়তে লেগে গেলাম। আমাদের গোপন আস্তানা যে বাড়িতে তার মেঝেতেই। খুঁড়ে চলেছি, জামাকাপড়ের কি অবস্থা সেদিকে হুঁস নেই। কতক্ষন কেটে গেছে খেয়াল নেই এমন সময় আমার হাতে উঠে এল একটা হাড়। আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।
'পাওয়া গেছে!!!'

পিন্টুও ছুটে এসে একরকম আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েই দেখতে শুরু করল। আমি জিজ্ঞেস করলাম,"হ্যাঁ রে, এখানে তো কেউ আগে কখনো থাকতো না, কিসের হাড় হবে বলে তোর মনে হয়।'
'আমার তো মনে হচ্ছে এটা কোন লুপ্ত প্রানীর হাড় হবে। ডাইনোসর হতে পারে। চল ভাল করে খুঁজি। আমার মনে হয় আরো পাওয়া যেতে পারে। তারপরে আমরা ডাক্তারজেঠুকে দেখিয়ে নেব-'
কিছুক্ষনের মধ্যেই আমাদের মধ্যে আর কোন সন্দেহ হইল না এটা কোন ডাইনোসরের হাড়। কারন আরো বেশ কিছু হাড় পাওয়া গেল। আমরা আনন্দে নাচানাচি শুরু করেদিলাম। ঠিক হল আমাদের নামে তার নাম দেওয়া হবে - টুবলুসরাস রেক্স বা পিন্টুসরাস রেক্স।

৪

আমরা আবার মাঠের কোনে বসে আছি। দুজনে দুজনের দিকে পিঠ দিয়ে। কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারছি না।

ময়লা জামাকাপড়েই ছুটেছিলাম ডাক্তারজেঠুর বাড়ি। জেঠু চা খাচ্ছিলেন। আর আমরা টেবিলের ওপরে

সাজিয়ে রেখেছিলাম হাড়্গুলো। আমাদের অনেক পরিশ্রমের ফসল। বুক ঢিপঢিপ করছে, আর কিছুদিনের মধ্যেই আমরা বিখ্যাত হয়ে যাব। এমন সময় জেঠু এসে হাড়্গুলো একবার দেখেই আমাদের দিকে গম্ভীরভাবে তাকালেন। 'এগুলো আমার টেবিলের ওপরে রাখতে কে বলেছে?'

'না, মানে কেউ বলেনি,আসলে আমরা একটু আগেই এই ডাইনোসরটাকে আবিষ্কার করেছি। এক জায়গায় মাটি খুঁড়ে পেয়েছি এইসব হাড়।' আমতা আমরা করে বললাম।

'ডাইনোসরের হাড় না ঘোড়াড্ডিম। এগুলো কুকুরের হাড়। কোত্থেকে ময়লা ঘেঁটে আমার ডেস্কটা নোংরা করলি। তোদের নিয়ে আর পারি না। যা শিগগির ফেলে দে, আর বাড়ি গিয়ে ডেটল দিয়ে ভাল করে চান করবি। আমার কথা মনে থাকে যেন।'

হাড়্গুলো ফেলেদিয়ে এসে অবধি আমরা এইভাবে বসে আছি।

শেষে পিন্টুই মুখ খুলল,''আবিষ্কার করা মনে হয় আমাদের দ্বারা আর হল না'

'হুমম-'

'আমি ভাবছিলাম এর চেয়ে বরং গোয়েন্দা হওয়া যাক।'

'ঠিক বলেছিস', আমি হাঁটুর ওপর মাথা রেখে বললাম।

অভ্র পাল
কারডিফ, ওয়েলস্, যুক্তরাষ্ট্র

অলংকরনঃ
কৌস্তুভ রায়
আহমেদাবাদ, গুজরাত

মৌমাছি ও শামুক

একদিন এক রানী মৌমাছি তার দলবল নিয়ে মধুর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সজোরে ভোঁ ভোঁ করে শব্দ করে উড়তে উড়তে তারা এসে পড়ল এক শামুকের বাড়ির সামনে। মা শামুক ওদের দেখেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

বলল – 'আমার ষোলোটা ছেলেমেয়ে বাড়িতে ঘুমাচ্ছে। তারা এখনও খুব ছোট। হাঁটতে শুরু করার আগে তাদের আরো পনেরো দিন ঘুমানোর দরকার। তোমরা সবসময় এরকম বিশ্রী কানফাটানো আওয়াজ করলে তারা ঘুমাবে কি করে? গতকাল তোমার বাড়ির লোকজন তাদের সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এসে সারাদিন এখানে ছিল আর ভীষন কোলাহল করেছে। আজ আবার তুমি এসেছ বিরক্ত করতে। এই ভয়ানক আওয়াজ সহ্য করতে না পেরে আমার কোন ছেলেমেয়ে যদি মারা যায় তাহলে আমি গিয়ে তোমাদের গোটা বাড়ি ভেঙ্গে তছনছ করে দেব। তোমাদের কোথাও থাকার জায়গা থাকবে না তখন। তোমরা কি জানো যে এই গাছটা আমার নিজের। আমার মালিক কুড়ি বছর আগে আমাদের জন্যে এই গাছটা লাগিয়েছিল, যাতে এর ফল খেয়ে আমরা বেঁচে থাকতে পারি। কিন্তু প্রত্যেক বছর যখনই এই গাছে ফুল ফোটে তখনই তোমরা দল বেঁধে আস আর সব মধু চুরি করে খেয়ে চলে যাও। তার ওপর সারাক্ষন বিদ্ঘুটে শব্দ করে আমাদের বিরক্ত করো। এক্ষুনি যদি তোমরা এখান থেকে বিদায় না হও তো আমি আমার মালিক আর আমার বাড়ির অন্যান্য লোকজনদের ডাকবো।'

তখন রানী মৌমাছি বলল – 'তোমরা ধূলো আর নোংরা থেকে জন্মেছ। তোমার কোন মালিক নেই। বাড়িতে অন্য কোন লোকজনও নেই। কোন কালে তোমার পূর্বপুরুষরা সবাই মারা গেছে। তাও কোন মানুষ গ্রাহ্য করনি। কারন এই বিশাল পৃথিবীতে তোমরা কারো কাজে লাগ না। কিন্তু আমরা হলাম মৌমাছি। আমাদের তৈরী মধু খেয়ে মানুষরা ভালো থাকে, শরীরে বল পায়, সাস্থ্য ভালো হয়। মধু ওষুধের থেকেও উপকারী। মৌমাছিরা সারা পৃথিবীর সব জায়গায় আছে। সমগ্র মানবজাতি আমাদের ভালোবাসে। তাই আমাদের জন্যে তারা ফুল গাছ লাগায়। তোমরা কি মনে করো তোমরা মানুষের থেকেও উঁচু দরের কোন প্রানী?

একটা গল্প বলি শোন। একদিন একটা দুষ্টু ছেলে আমাদের বাড়ি ভেঙ্গে দিতে এসেছিল। কিন্তু তার মা তাকে বলল – তুমি অনেক কিছু ভেঙ্গে নষ্ট করো। কিন্তু খবরদার মৌমাছির বাসায় হাত দিও না। ওরা সারাদিন কত পরিশ্রম করে আমাদের জন্যে মধু সংগ্রহ করে। কোন রানী মৌমাছিকে যদি তুমি

মেরে ফেল তাহলে তার সব ছেলেমেয়েরা আমাদের ছেড়ে চলে যাবে। তখন শীতকালে আমরা রুটি দিয়ে খাওয়ার মতো একটুও মধু পাবো না। তখন ছেলেটা মায়ের কথা শুনে এখান থেকে চলে গেল। সে পাখি ধরতে পারে, মাছ ধরতে পারে, ফুল ছিঁড়তে পারে, যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। কিন্তু আমাদেরকে কক্ষনো বিরক্ত করবে না কারন আমরা খুব উপকারী প্রানী। তোমরা কী? তোমরা সারাদিন শুধু শম্বুক গতিতে চলাফেরা করো, কারো কোন কাজে লাগো না। '

মা শামুক এই শুনে খুব রেগে গেল। সে বাড়িতে গিয়ে ছেলেমেয়েদের বলল – 'শোন সবাই। মৌমাছিরা আমাদের শত্রু। পনেরো দিন পরে তোমরা হাঁটতে শিখে যাবে। তখন তোমাদের মধ্যে পাঁচজন মৌমাছিদের বাড়ি গিয়ে ওদের মৌচাকটা ভেঙ্গে দিয়ে আসবে।'

২

দেখতে দেখতে পনেরো দিন কেটে গেল। মা শামুকের ছেলেমেয়েরা হাঁটতে শিখে গেল। তখন তাদের মধ্যে পাঁচজন শামুক মৌচাক ভাঙ্গা অভিযানে বেরলো। হাঁটতে হাঁটতে তারা যখন মৌচাকের কাছে গিয়ে পৌঁছল তখন ঘরে কোন মৌমাছি ছিল না। সব মৌমাছি মধু সংগ্রহে বেরিয়েছে। তাই দেখে শামুকরা ভারি খুশি হল। বলল – 'চলো আমরা এখন যত পারি মধু খাই।' সন্ধ্যের আগে পর্যন্ত তারা মধু খেয়েই চলল। এপাশে সন্ধ্যে হতেই সব মৌমাছিরা দলবেঁধে গান গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে বাজনা বাজাতে বাজাতে বাড়ি ফিরে এলো। এসেই ঐ পাঁচটা শামুককে দেখতে পেয়ে খুব অবাক হল তারা।

রানী মৌমাছি বলল – 'তোমরা এখানে কেন এসেছ? আর কেনই বা আমাদের সব মধু খেয়ে নিচ্ছ? এটা তোমাদের বাড়ি নয় আর এই মধুও তোমাদের খাবার নয়। এখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। তোমাদের বাড়ি ফিরে যেতে অসুবিধে হতে পারে। তাই আজকের রাত্রিটা আমি তোমাদের এখানে থাকতে দিতে পারি। কিন্তু তোমাদের কথা দিতে হবে যে ছোট্ট মৌমাছিদের তোমরা কোন ক্ষতি করবে না।'

পাঁচটা শামুকের মধ্যে যে সব থেকে বড় ছিল সে হেসে উত্তর দিল – 'তোমাদের মধুটা খেতে খুব ভালো। আমরা সপরিবারে এখানে চলে এসেছি। শুধু একটা বা দুটো রাত নয়। আমরা এখন থেকে বরাবরের জন্যে এখানেই থাকব। আর যতদিন না সব মধু শেষ হয়ে যায় ততদিন আমরা এই মধুই খেয়ে যাব।'

রানী মৌমাছি বলল – 'শুধু একটা রাত্রি আমি তোমাদের থাকতে দিতে পারি। কোনভাবেই সারাজীবন তোমরা এখানে বসবাস করতে পারনা। তাছাড়া তোমরা কোন ভালো কাজ করেও আমাদের সাহায্য করতে পারবে না। এখন তো তোমাদের একটা রাত্রি এখানে থাকতে দিতেও আমার চিন্তা হচ্ছে। যখন আমরা ঘুমাবো তখন হয়তো মৌচাকের সব মধু তোমরা খেয়ে শেষ করে ফেলবে বা আমার ছেলেমেয়েদের মেরে ফেলবে।'

চিন্তিত মুখে রানী মৌমাছি ওখান থেকে চলে গেল। তারপর বৃদ্ধ জ্ঞানী মৌমাছিদের ডেকে বলল – 'আজ রাত্রে তোমরা ঘুমিয়ো না। আমি ঐ শামুকগুলোকে বিশ্বাস করতে পারছি না।'

পরদিন সকালে জ্ঞানী মৌমাছিরা রানী মৌমাছিকে এসে জানালো – 'মোট পঁয়ত্রিশটা শিশু মৌমাছি কাল রাত্রে মারা গেছে। শামুকগুলো আমাদের সব ঘরে ঢুকে সারা রাত ঘুরে বেড়িয়েছে। সব মধুতে মুখের নোংরা লাগিয়ে দিয়েছে। সব মধু বিষাক্ত করে দিয়েছে। এই বিষাক্ত মধু খেলে মানুষরা ও মারা যেতে পারে। মহামান্য রানী, আমাদের উচিত এক্ষুনি ওদেরকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া।'

রানী মৌমাছি বলল – 'আমরা আর একদিন দেখবো। এর মধ্যে ওরা স্বেচ্ছায় চলে না গেলে আমরা উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।'

তারপর রানী মৌমাছি গেল শামুকদের সঙ্গে কথা বলতে।

– 'বন্ধুগন, তোমাদের বেশ সাস্থ্যবান দেখাচ্ছে। আমি জানি তোমরা এখানে বেশ মনের আনন্দে রয়েছ। এখানকার মধুও তোমাদের খুব সুস্বাদু লেগেছে। কিন্তু তোমরা আমাদের ঘরে থাকা শিশু মৌমাছিদের মেরে ফেললে কেন? আর কেনই বা আমাদের সব মধু নষ্ট করে দিয়েছ?'

শামুকরা কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল।

– 'আমার মনে হয় আমি জানি কেন এটা করেছ তোমরা। আমার বিশ্বাস তোমরা আমাদের শত্রু। কিছুদিন আগে এক মা শামুকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল যে আমাদের খুব বকাঝকা করেছিল। সে নিশ্চয় তোমাদের মা। সে যাই হোক। আমি এখন যা বলছি তা মন দিয়ে শোন। কাল দুপুরের মধ্যে যদি তোমরা এই বাড়ি ছেড়ে না চলে যাও তাহলে তোমরা সবাই এখানেই মারা যাবে।'

দুষ্টু ও অহংকারী শামুকের দল তাচ্ছিল্যের সুরে বলল – 'তোমাদের যা ইচ্ছে তাই করো। আমরা এখানেই থাকবো। আমরা স্বাধীন। আমাদের যেখানে ইচ্ছে করে সেখানে যাবো, যা ভালো লাগবে তাই

খাবো। এখন আমাদের এই মৌচাকের মধু খেতে ভালো লাগছে, তাই আমাদের ইচ্ছে হলে সব মধু আমরা খেয়ে শেষ করে দেব। মোটকথা আমরা এখান থেকে নড়ব না। এখানেই থাকব। দেখি তোমরা কী করতে পারো। '

তখন রানী মৌমাছি খুব গম্ভীর হয়ে গেল। সে তার সেনাবাহিনীকে ডেকে পাঠালো। তাদের বলল – 'তোমরা সবাই যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও। কাল দুপুর পর্যন্ত সব মোম প্রস্তুত করে রাখো। তরবারিতে ধার দিয়ে তৈরী থাকো যুদ্ধের জন্যে।'

সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীর মধ্যে সাজো সাজো রব পড়ে গেল। হুলই তাদের তরবারি। হাজার হাজার সেনা মৌমাছি তাদের হূল শানিয়ে অপেক্ষা করে রইল।

পরদিন দুপুর বেলা শামুকরা কেউ মৌচাক ছেড়ে গেলনা। তাই দেখে রানী মৌমাছি যুদ্ধ শুরুর আদেশ দিল। 'সবাই রন হুংকার দিতে শুরু করো। দরকার পড়লে হুল ফুটিয়ে শামুকদের মেরে ফেলবে।'

আদেশ পেয়েই সেনা মৌমাছিরা ভয়ংকর জোরে ভোঁভোঁ আওয়াজ করে রন হুঙ্কার দিতে শুরু করল। শামুকরা সেই আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে যে যার নিজেদের খোলের মধ্যে গুটিয়ে ঢুকে গেল। তখন রানী আদেশ দিল – 'মোম আনো জলদি।'

কিছু সেনা মৌমাছি আওয়াজ করে ওদের ভয় দেখিয়ে চলল। আর কিছু মৌমাছি মোম নিয়ে এসে ওদের মুখের কাছে ঢেলে দিয়ে মুখটা পুরো বন্ধ করে দিলো। দু ঘন্টার মধ্যে শামুক গুলোর এমন অবস্থা হল যে তারা না পারল একটুও নড়াচড়া করতে, না পারল নিঃশ্বাস নিতে।

তখন রানী মৌমাছি সব শামুকদের উদ্দেশ্যে বলল – 'আমি প্রথমে ভেবেছিলাম যে তোমরা আমাদের বন্ধু। তাই তোমাদের রাত্রে থাকতে দিয়েছিলাম, পেট ভরে মধু খেতে দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমরা ভেবেছ ভগবান এই গোটা পৃথিবীটা শুধু তোমাদের একার জন্যেই বানিয়েছেন। তোমরা ছাড়া আর কেউ সেখানে থাকতে পারবে না। তোমাদের এতো নীচু মন। তোমরা যদি এরকম ক্ষুদ্র ও দুর্বল প্রানী না হয়ে কোন পাখি বা জন্তুর মতো বড় ও শক্তিশালী প্রানী হতে তাহলে এই পৃথিবীতে আর অন্য কোন প্রানীরই স্থান হত না। এত করে বলা স্বত্বেও এখান থেকে চলে যেতে রাজী হলে না, এখন এখানেই মরো। এটাই তোমাদের যোগ্য শাস্তি।'

তারপর রানী সব মৌমাছিদের নিয়ে আবার একটা নতুন মৌচাক তৈরী করল ও সেখানেই বসবাস করতে থাকল।

একদিন মৌমাছিদের মালিক এলো মধু নিতে। সে দেখল মৌচাকে কোন মৌমাছি নেই, শুধু পাঁচটা মরা শামুক পড়ে আছে। মালিক সববুঝতে পারল। বলল – 'এই মৌচাকের মধু বিষাক্ত। এটা কে ভালো করে পরিস্কার করতে হবে।' এই বলে সে সব বিষাক্ত মধু আর মরা শামুকদের মাটিতে ফেলে দিলো।

মৌমাছিরা বহাল তবিয়তে সুখে শান্তিতে বেঁচে রইল ও মানুষের উপকার করতে থাকল।

(নীতি বাক্য - গর্বিত ও স্বার্থপররা সব কিছু নিজেরা ভোগ করতে চায়, কিন্তু তারা কিছুই পাওয়ার উপযুক্ত নয়।)

(চীনা লোক কথা / নীতি কথা)

অনুবাদঃ
রুচিরা
বেইজিং,চীন

আনমনে: আমার ছোট্টবেলাঃ পর্ব ৬

পর্ব-৬

পুজোর পর অনেকদিন পরে দেখা হল। ভালো আছো তো? নতুন বছরের আন্তরিক ভালবাসা নিও। আমার ছোট বেলার কথা শুরু করি এবার কি বল? শরতে যেমন দুর্গা পূজো, পরের ঋতু হেমন্তে তেমনি রয়েছে কালীপূজো। এ বছর অবশ্য শরতেই হয়ে গেল পঞ্জিকার নির্দেশে।

এখন কালীপুজোয় কত কিছু হয়। আলো, মাইকের হল্লা,বাজী, বিরাট বিরাট সব মন্ডপ ইত্যাদি নিয়ে বিশাল এক কান্ডকারখানা। আমাদের ছোটবেলায় এত সব হোত নাকি? আলোই বা কোথায়, আর বাজীই বা কোথায়। অবশ্য একটা বাজীর কথা জানতাম, সেটা যথা সময়ে বলব।

গ্রামে একটা কালীবাড়ি ছিল, যেমন সব গ্রামেই থাকে। সেখানে পুজো হোত।পুজোর দিন হৈ চৈ হত বটে তবে আমরা বিশেষ অংশ নিতে পারতাম না। অন্ধকারে অত রাতে কোথায় আর আনন্দ করব বল?

তবে পুজোর আগের দিনটা ছিলো আনন্দের। সেদিন হোত চৌদ্দ শাক খাওয়া আর সন্ধ্যায় চৌদ্দ প্রদীপ দেওয়া। তোমরা হয়ত বলবে, এ আর এমন কি কথা, এ ত এখনো সবাই করে। ঠিক কথা। কিন্তু যারা শহরে থাক তারা ত বটেই, অন্যেরাও শাক আর প্রদীপ বাজার থেকে কিনে আন, তাই না?

আমি কি করতাম বলত? দিয়ানী আর ছোট মাসির সাথে শাক সংগ্রহে লেগে পড়তাম বাগান ঘুরে ঘুরে।

আর প্রদীপ? দিয়ানী নিজের হাতে প্রদীপ গড়তেন। কয়েক দিন আগে তৈরী করে রোদে শুকিয়ে নিয়ে,

পরে সেগুলোকে উনুনের আগুনে পুড়িয়ে নিতেন। এরপর পলতে পাকাতেন নিজেই। পুজোর আগের দিনটা হল ভূতচতুর্দশী। ঐ দিন সন্ধ্যায় প্রতি ঘরের দরজায়, সব ক'টি উঠোনের প্রবেশপথে ঐ সব প্রদীপ দেয়া হত।

আমারও আর একটা কাজ থাকত ঐ দিন সন্ধ্যায়। এক গোছা পাটকাঠিতে আগুন জ্বেলে মশাল তৈরী করে বাড়ীর চারপাশ দৌড়ে ঘুরে আসতে হত। সব বাড়ীর সব ছেলেরাই এটা করত। মশাল নিভে যাবার আগে কে কত বার চক্কর দিয়েছে সেটা নিয়ে বড়াই করতাম আমরা।

প্রদীপ জ্বালান, মশাল দৌড়-- এসব করে কি হত বলত?এতে নাকি ভূতেরা ভয় পেয়ে বাড়ীর চৌহদ্দী ছেড়ে পালায়। পূজোর দিন রাতে কালিবাড়ীতে যে পূজো হচ্ছে সেটা টের পেতাম রাতে শুতে গিয়ে। মানুষ জনের কথাবার্তা, ঢাকের বাদ্যি -- সবই শোনা যেত আমাদের বাড়ী থেকে। কাছাকাছি ছিল কিনা। সকালে পূজোর প্রসাদ পেতাম।

কালী পূজোর এক দিন বাদেই ত আবার ভাইফোঁটা। মামার বাড়ীতে ত আমার বোনেরা থাকত না, ওরা থাকত পাবনায়। আর মামার বাড়ীতে মামাত বা মাসতুতো বোনও ছিল না। তাই আমাকে ফোঁটা দেবার কেউ ছিল না।

অথচ ছোট মাসি মামাদের ফোঁটা দিতেন। মামাদের হবে আর আমার হবেনা তা কি হয়? দিয়ানীই আমাকে সাজ গোজ করিয়ে একসাথে বসিয়ে ফোঁটা দিতেন। খুব মজা লাগত আমার দিয়ানীর হাতে ফোঁটা পেয়ে। তার পর সবার সাথে ভালমন্দ খাওয়া দাওয়া হত মজা করে।

এর আগে শরতের কথা বলতে গিয়ে সন্ধ্যায় হিম পড়ার কথা বলেছি। হেমন্তেসেই হিমের পরিমাণ বাড়ত আস্তে আস্তে।

সন্ধেটা হয়ে যেত ধোঁয়াটে। বাইরে খোলা জায়গায় দাঁড়ালে হিম পড়ে চুল ভিজে যেত। চারিদিক কেমন একটা ভুতুরে চেহারা নিত। সকালে ঘাসের ডগায় থাকত বিন্দু বিন্দু শিশির। সেই সব শিশির বিন্দু সকালের রোদে হিরের মত জ্বলজ্বল করত। কোন কোনওটা আবার ভিন্ন ভিন্ন রং ছড়াত। রামধনুর মত।

একেবারে প্রথমে লিখেছিলাম যে রোজ একটা ঘুঘুপাখি আমার ঘুম ভাঙাত!হেমন্তের কোন কোন দিন ঘুঘুর ডাকের আগেই ঘুম ভেঙে যেত। শিশিরের শব্দে! নিশ্চয় অবাক হচ্ছ, ভাবছ শিশির পড়ার আবার শব্দ হয় নাকি? আমি বলি হয়। আমি যে ঘরে শুতাম তার গা ঘেঁসে একটা লিচু গাছ ছিল। বেশ বড়,অন্য লিচু গাছের তুলনায়। তবে সেটা টিনের চালা ছাড়িয়ে বেশী উঁচুতে উঠতে পারে নি। শিশির পড়ে পড়ে সেই গাছের পাতা ভিজে শপ শপে হয়ে যেত। পাতায় জল বেশী হয়ে গেলে গড়িয়ে সেটা টপাত টপাত করে থেমে থেমে পড়ত টিনের চালায়। কি মিষ্টি যে সে শব্দ যে না শুনেছে তাকে বলে বোঝানো যাবে না।

ঘুঘু ডাকার আগেই ঘুমটা ভাঙত ঐ শব্দে। আর ঘুম আসত না। কি করে আসবে বল। সেই জলের ফোঁটা টিনের চালা গড়িয়ে মাটিতে পড়ত আবার। এবার শব্দটা হত অন্য রকম। কি রকম?সেটাও ত বোঝানো যাবে না। তবে শব্দটা ছিল ভারি মিঠে। এর মধ্যেই কখন ঘুঘুটা এসে চালে বসে পড়ত আর ডাকত,'গোপাল ঠাকুর-----'।

সন্ধ্যা নামলেই বোঝা যে শীত আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। সেটা আরও বেশী করে বোঝা যেত রাতে শুতে গিয়ে। গা শির শির করত। দিয়ানী গায়ে দিয়ে দিতেন একখানা কাঁথা। তাঁর নিজের হাতে তৈরী করা। হেমন্তের অল্প শীতে কাঁথার নিচে শুয়ে ঘুমতে ভারি আরাম।

কাঁথা কাকে বলে জান? মা-ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার। আমিও একটু বলি। কয়েকখানা পুরোন পরিষ্কার কাপড় মাপ মত কেটে নিয়ে একখানার ওপর আরও কয়েকটা পর পর রেখে একটু পুরু হলে সেগুলোকে সেলাই করে নিলেই হয়ে যায় কাঁথা। প্রয়োজন মত পুরু বা পাতলা করা যায়। সেলাই করা হয় নানা রকম নক্সা করে। দেখতেও হয় দারুন সুন্দর সুন্দর।

আমাদের বাড়ীর পশ্চিম দিকে ছিল বাইরের উঠোন। সেই উঠনটা পার হয়েই ছিল একটা মাঠ, যে মাঠে ছোটমামারা খেলাধুলা করতেন। ফুটবল ছাড়াও খেলতেন আর এক রকমের খেলা যার নাম ছিল 'তেকাঠি' খেলা। কতকটা ক্রিকেট আর বেস বল খেলাকে মিলিয়ে তৈরী। অবশ্য তখন এসব খেলার নামও জানতাম না।

সেই মাঠের পরে ছিল 'বড়সড়ক',মানে বড় রাস্তা। নামেই বড়। কেননা সেটা ছিল কাঁচা রাস্তা। গরুর গাড়ীর চাকার চাপে দুদিকে গভীর গর্ত তৈরী হয়েছিল সেই রাস্তায়। মাঝ বরাবর ছিল পায়ে চলা পথ। বর্ষায় জলের নীচে চলে যেত গোটা রাস্তা। রাস্তাটা যেমনই হোক, তা বলে 'বড়সড়ক' কেন?এর কারন এত দীর্ঘ রাস্তা গ্রামে ছিল না। তাছাড়া ওটা ছিল পাশাপাশি কয়েকটি গ্রামের একমাত্র যোগাযোগকারী রাস্তা। এছাড়াও ছিল তার ধার দিয়ে কিছুটা দূর দূর টেলিগ্রাফের খুঁটি পোঁতা। খুঁটিতে কান পাতলে শণ্ শণ্ শব্দ শোনা যেত।

বড় সড়কে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু ধানক্ষেত আর ধানক্ষেত। হেমন্তে সেই সব ধান পেকে উঠছে আর তাতে ধরছে সোনালী রঙ। আর একটু পেকে গেলে সেটা কেটে বাড়ীতে নিয়ে আসা হবে। এর পর হবে 'মলন' দেওয়া, যে কথা আগে একবার বলেছি।

হেমন্তে বা শীতের শুরুতে আর একটা ছোট পুজোর মত ব্যাপার হত। একে বলা হত 'গাস্‌সি' অথবা 'গাস্যি'। জানিনা কোন বানানটা ঠিক। জানবার উপায় ও নেই। একদিন খুব ভোরে ঠান্ডায় হি হি

করে কাঁপতে কাঁপতে জেগে উঠত সবাই। এর পর উঠোনে কিছু একটা পুজো হত। এরপর আমার একটা ভুমিকা থাকত। সেটা বেশ মজার। আমার হাতে দেওয়া হত একটা গোটা পান, গোটা সুপারি, কলা আর একটা মিস্টি। সে সব নিয়ে অন্ধকারে শীতের মধ্যে আমাকে গোটা বাড়ীর চারিদিক এক পাক ঘুরে আসতে হত। কলা আর মিষ্টিটা ছিল আমার পাওনা।

এরপর পাটকাঠির আগুন জ্বেলে হাত সেঁকত সকলে। বাড়ীর পুরুষেরা প্রত্যেকে একটা করে পাটকাঠির একপ্রান্তে আগুন জ্বেলে সিগারেট পান করার মত করে ধোঁয়া টানতে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। আমিও বাদ যেতাম না। মজা পেতাম এই ভেবে যে বড়দের সাথে তাদের মত করে ধুমপান করছি আর কায়দা করে ধোঁয়া ছাড়ছি। কারও বারণ করার আর আমার তা শোনবার মত কিছু নেই। পুজো কিনা!

নানা আনন্দের মধ্যেও একটা নিরানন্দের ব্যাপার সব সময় মনকে বিব্রত করত, যেটা তোমাদেরও করে। পুজোর ছুটির পরেই বার্ষিক পরীক্ষা যে! এই সময় ছোটমামা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করতেন। উঁচু শ্রেণীতে পড়তেন ত।

একটা মজাদার কথা শোন। সে সময়ে প্রায় সব শ্রেণীতেই বাংলা পরীক্ষায় কয়েক লাইন কবিতা মুখস্থ লিখতে হত। তাছাড়া কবিতার বিষয় বস্তু জানারও প্রয়োজন থাকত। সে কারণে কবিতা গুলো ভালভাবে মুখস্থ করতেই হত। আর তাতে প্রান হয়ে উঠত ওষ্ঠাগত। ছোটমামা আর তাঁর কয়েকজন বন্ধু মিলে বড় বড় কবিতা মুখস্থ রাখার চমতকার এক উপায় বের করেছিলেন। কবিতার প্রতিটি লাইনের প্রতিটি শব্দের প্রথম বা প্রথম দুটো অক্ষর পর পর লিখে নিয়ে শুধু সেটা মুখস্থ করতেন। সেটা জানা থাকলেই সমস্ত লাইনটা লিখে ফেলা যেত।

এরকম একটা কবিতার দুটো লাইনের কথা মনে আছে। সেটা ছিল কবিগুরুর 'বঙ্গমাতা' কবিতা। লাইন দুটো হল--
' পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রেখ নাকো ভাল ছেলে করে।'
ছোটমামা মুখস্থ করতেন এইভাবে--
' প প ছো ছো নিষে ডো
বে বে রে না ভা ছে কো।'
কেমন বল, মজার না?

শিউলি ফুল কুড়ানো নিয়ে পরে বলব বলেছিলাম। পুজোর কাজে যে লাগত সে'ত আগেই বলেছি। এছাড়া আমার কাজ ছিল ফুলের রঙিন বোঁটাগুলো পাপড়ি থেকে আলাদা করে নিয়ে রোদে শুকতে দেওয়া। বোঁটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে হাতের নখ আর আঙুল গুলো রঙিন হয়ে যেত। কয়েকদিন ধরে শুকিয়ে নিলে বোঁটাগুলো চা পাতার মতো কুরকুরে হয়ে যেত। বেশ কিছুদিন ধরে এরকম শুকনো বোঁটা জমিয়ে রাখতেন দিয়ানি। সরস্বতী পূজোর সময় ঐ শুকনো বোঁটা দিয়ে কাপড় রাঙানো হত বাসন্তী রঙে। কেমন করে বলতে পারবে?

বোঁটাগুলো গরম জলে ফোটালে জলটা রঙিন হয়ে যেত। তাতে নতুন কাপড় ডুবিয়ে রোদে শুকিয়ে নিলেই হয়ে যেত বাসন্তী রঙের ধুতি। পুজোর দিনে সেই কাপড় পরে যেতাম অঞ্জলি দিতে। তুমি এই

ভাবে অঞ্জলি দিয়েছ কখনো? রঙিন কাপড় পাবে কোথায় তাই ভাবছ? মা'কে বলেই দেখ না একবার।

গ্রামে একটাই সরস্বতী পুজো হত, আর সেটা করতেন ছোটমামাদের দল। খুব হৈ চৈ হত। একবার কি হল শোন। ঐ দলের একজনের একবার কলকাতার আলো ঝলমলো পুজো দেখে এসে গ্রামের পুজোতেও আলো জ্বালানোর ইচ্ছা হল। কিন্তু গ্রামে আলো আসবে কোথা থেকে!

অনেক ভেবে শেষে টর্চের বাল্ব আর ব্যাটারী দিয়ে আলো জ্বালানো ঠিক হলো। কিন্তু তারের কি হবে? কোথায় পাওয়া যাবে তা? ভেবেচিন্তে উপায় বেরোল একটা। কামার বাড়ী গিয়ে বলে কয়ে ওরা জোগাড় করলেন তামার পাত থেকে সরু করে কাটা লম্বা দু'টুকরো পাত। পাতজোড়ার দুপ্রান্তে বাল্ব আর ব্যাটারী জুড়ে আলো জ্বালানো হতেই সবাই হৈ হৈ করে উঠল।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল আলোটা কোথায় রাখলে ভাল হবে তা নিয়ে। একজন পরামর্শ দিলেন একেবারে মুখের সামনে রাখতে, কেননা তাতে নাকি মুখটা ভাল দেখা যাবে। কিন্তু কেউ ভেবেই দেখল না যে এতে প্রতিমার মুখটা দেখতে ভারি অসুবিধা হতে পারে। বড়রা কেউ কেউ সেকথা বলেছিলেনও। কিন্তু কে শোনে কার কথা! আলো জ্বলেছে এই খুশীতেই মগ্ন সবাই।

কালীপুজোর বাজির কথায় বলেছিলাম যে সরস্বতী পুজোয় বাজি হয়। সেই বাজি ছিল একটা শব্দবাজি। তোমরা চাবিকামান* কি সেটাত জান? এর মতই কতকটা ছিল সেই বাজি। কিন্তু তা ছিল অনেক বড় আর শব্দও হত খুব জোরে।আর এতে চাবিকামানের মত দেওয়ালে বা মাটিতে না ঠুকে আগুন দেওয়া হত। শব্দ শুনে আনন্দ পেলেও ভেব না যে ব্যাপারটা ভাল ছিল। যদিও সেটা তখন জানতাম না। বাঁশের চোঙের মতো দেখতে একটা আটদশ ইঞ্চি দীর্ঘ লোহার নলের নিচের দিকটা হত সরু, যাতে নলটা মাটিতে শক্ত করে গেঁথে রাখা যায়। পুরু দেওয়ালওয়ালা ঐ নলের তলাটা একদম বন্ধ হলেও দেওয়ালের নীচের দিকে একটা ছোট্ট ছিদ্র থাকত।

এবার নল মোট যতটা লম্বা তার অর্দ্ধেকটায় ঠেসে বারুদ ভরা হত, আর বাকীটায় ঠাসা হত আঠালো মাটি। এতে ছোট ছিদ্রের মধ্যেও সামান্য বারুদ এসে যেত। এরপর ফাটাবার সময় বারুদভরা নলের সরু দিকটা মাটিতে পুঁতে দেওয়া হত এমনভাবে যাতে ওপরের দিকটা একটু হেলে থাকে একদিকে। হেলানো হত সেইদিকে যেদিকে ফাঁকা মাঠ আছে। এরপর একটা লম্বা পাটকাঠিতে আগুন জ্বেলে নলের সরু ছিদ্রের সামনে ধরা হত। বারুদে আগুন লাগলে প্রথমে হাওয়াই বাজির মত ফুলকি বেরত, আর তার পরেই 'দড়াম'। সে আওয়াজ বহুদুর পর্যন্ত শোনা যেত।

এরকম অনেকগুলো ফাটান হত।এছাড়া আর কোন বাজির কথা মনে পড়ে না। বাজি নিয়ে আর কোন কথা মনে পড়লে পরে জানানো যাবে, না কি বল!

(চলবে)

*সংযোজনঃ এখন প্রায় সব চাবির মুখই নিরেট হয়। কিন্তু আগে অনেক চাবির মুখ ফাঁপা হত।

চাবির পেছনে যে রিং থাকে অর্থাৎ যেখানে চেপে ধরে চাবি ঘোরান হয় সেখানে লম্বা সরু একটা কঞ্চি ঢুকিয়ে শক্ত করে বাধাঁ হত। এর নাম কামানের হাতল। এবার চাবির ফাঁপা মুখে দেশলাই কাঠির মাথা থেকে বারুদ ছাড়িয়ে নিয়ে, ঐ বারুদটা ভরে দেওয়া হত। এর পর চাবির মুখের মাপে একটা পেরেক নিয়ে বারুদের ওপর চেপে বসিয়ে হাতল ধরে দেওয়ালে জোরে ঠুকে দিলেই ফটাস করে ফাটত চাবি কামান। পেরেকটা যাতে পড়ে না যায় সেজন্য সুতো দিয়ে সেটা হাতলে বাঁধা থাকত।

সন্তোষ কুমার রায়
রূপনারায়ণপুর, বর্ধমান

মনের মানুষ: আশাপূর্ণা দেবী

আমাদের এই সংখ্যার মনের মানুষ আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫)। তুমি কি আশাপূর্ণা দেবীকে চেনো? পড়েছ তাঁর লেখা কোনও গল্প? সেই যে করালী চোর আর কৃতান্ত দারোগার গল্প, যেখানে কিনা বিখ্যাত চোর করালী রাত্তির বেলা চুরি করতে বেরোচ্ছে না, কারন তার পা শামুকের খোলায় কেটে গেছে; এদিকে খোদ থানার ভেতর থেকে বড়-দারোগার জিনিষপত্র চুরি হয়ে গেল!!

বা হিটুর দুঃখের গল্প, যেখানে বড়রা কিছুতেই তার মনের কথা বুঝতে পারে না, বড়রা দোষ করলেও বকুনি খেতে হয় ছোট্ট হিটুকেই...

কিম্বা গোবিন্দ আর ভুনিপিসির গল্প? সেই যে 'পুঁয়েখাওয়া হাড়গিলে পিলেপেটা' গোবিন্দ, যাকে কিনা দেখতে পেয়েই ভুনি পিসি দূর দূর করে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন! কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই ভুনিপিসিই কিনা হয়ে গেলেন গোবিন্দর ঠাকুমা!!

কি? এখন কি মনে হচ্ছে আশাপূর্ণা দেবীর গল্পগুলি পড়তে হবে? এইরকম কয়েকশো মজার, হাসির, ভূতের, রহস্যের, রূপকথার, ছোটদের মনের কথার গল্প তিনি লিখেছেন ছোটদের জন্য। ছোটদের পাশাপাশি তিনি বড়দের জন্যও সমান ভাবে লিখে গেছেন। কিন্তু তিনি নিজেই বলেছিলেন যে তিনি ছোটদের জন্য লিখতেই বেশি ভালোবাসেন। আর সেই লেখাগুলি যখন সুন্দর মলাটে বাঁধানো বই হয়ে ছেপে বেরোয়, তখন তিনি আরো খুশি হন।

এই ফাঁকে আশাপূর্ণা দেবীর ছোটবেলা সম্পর্কে একটা ছোট্ট কথা জানিয়ে রাখি। আশাপূর্ণার জন্ম হয়েছিল উত্তর কলকাতার এক যৌথ পরিবারে। সেই পরিবারে মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বা পড়াশোনার পাট ছিল না। ছোট্ট আশাপূর্ণা কিভাবে অক্ষর চিনেছিলেন জানো? তাঁর দাদাদের এবং ভাইদের পড়া শুনে শুনে। কিন্তু তাঁর মায়ের খুব বই পড়ার উতসাহ ছিল। তাঁর উতসাহেই আশাপূর্ণা এবং তাঁর বোনেরা বই পড়তে শুরু করেন। আর খুব অল্প বয়স থেকেই আশাপূর্ণা লিখতেও শুরু করেন। বাংলা

সাহিত্যে তাঁর অবদানের জন্য তিনি বহু পুরষ্কার এবং সম্মান পেয়েছেন। তার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ন হল জ্ঞ্যানপীঠ পুরষ্কার।

প্রায় সত্তর বছর ধরে ছোট এবং বড়দের জন্য নিয়মিত লিখে গেছেন আশাপূর্ণা দেবী। তাঁর গল্প-উপন্যাস পড়ে আনন্দ পেয়েছে পরের পর প্রজন্ম। এখন তুমি আশাপূর্ণা দেবীর লেখা ছোটদের জন্য গল্পগুলিকে পড়, আর বড় হলে পড়ে নিও তাঁর লেখা বড়দের গল্পগুলিও।

মহাশ্বেতা রায়
পাটুলি, কলকাতা

পড়ে পাওয়া: কখন কি হয়

'এই লোককে নিয়ে এলি তুই বাসন মাজতে?'

ভুনি পিসি দুই কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বলেন, 'বিশ্ব ভুবনে আর লোক খুঁজে পেলিনা খোকনা? এই পুঁয়ে-পাওয়া হাড়গিলে পিলেপেটা কোটর-চক্ষু চামচিকেটা, তোদের গুষ্টির বাসন মাজবে? বিদেয় কর, এখুনি বিদেয় কর।'

'খোকনা' মানে অবশ্য কোন শিশু নয়।

ভুনি পিসির ভাইপো হলেও, তিনি তাঁর নিজের ভাইপোদের 'জ্যাঠামশাই'।তাছাড়া তিনি তাঁর জামাইয়ের শ্বশুর, ছেলেমেয়েদের পূজনীয় পিতা এবং মস্ত বড় অফিসটার একেবারে হেড বড়োবাবু।যেখানে তাঁর নাম হচ্ছে পি. বি. চৌধুরী।

অর্থাৎ কিনা প্রভাতভূষণ চৌধুরী!

ভদ্দরলোকের বুদ্ধি -সুদ্ধি ভালোই ছিল, কিন্তু এবারে যে কি দুর্মতি ধরলো, পুজোর ছুটিতে গুষ্টিশুদ্ধ সকললে নিয়ে বেড়াটে এলেন জামতাড়ায়!

আর সক্কলের গার্জেন হিসেবে সঙ্গে নিয়ে এলেন ভুনিপিসিকে।

ভুনিপিসি ভুনিখিচুড়ি রাঁধেন বলেই যে তাঁর এই নামকরণ তা নয়, নামকরণের সময় তিনি বোধহয় খিচুড়ি-টিচুড়ি রাঁধতে তেমন শেখেনও নি, আসলে 'ভুবনমোহিনী'র অপভ্রংশ হচ্ছে গিয়ে 'ভুনি'।
সে যাক- প্রথমটা এসেই ভুনি পিসির ভুনি খিচুড়ি, আর বাড়িওয়ালার বাগানের মালির হাতের মুরগি, এই দুটোর যোগফলে বড়ো আনন্দেই কেটেছিল সবাইয়ের। মানে পি. বি. চৌধুরী বা প্রভাতভূষণের ছেলেমেয়ে, বৌ, শালী,জামাই, বেয়াই, ভাই, ভাই-বৌ, ভাইপো, ভাইঝি, ভাগ্নে, ভাগ্নী, ইত্যাদি প্রভৃতি সবাইয়ের।

কিন্তু মুশকিল হল- কলকাতা থেকে যে চাকর নিয়ে আসা হয়েছিল, সে হটাত একা রাতে উঠোনের

নিমগাছে ভূত দেখে, সেই যে আঁ-আঁ-আঁ শব্দে হাঁ করে চেঁচাল, সে হাঁ বুজল একেবারে কলকাতায় গিয়ে। তারপর সেই জীবনরতনের দেখাদেখি বাড়ির ছোটো ছেলেরাও কিছুদিন 'ভূত' দেখতে শুরু করেছিল, কিন্তু ভুনি পিসি বকুনির চোটে তাদের ভূত ছাড়িয়ে ছাড়লেন।

ভুনি পিসি এই বৃহত সংসারের যাবতীয় ব্যাপারই ম্যানেজ করে ফেলেছেন, কিন্তু মুশকিল বাধল ওই চাকরের ব্যাপারটায়।

জামতাড়ায় যে বাসন মাজার লোকের এত অভাব, তা কে জানত?

সত্যিই কি নিমগাছে ভূত ছিল? আর নতুন কাজের লোক কি পাওয়া গেল? ভুনি পিসি কিভাবে এই সমস্যার মুশকিল আসান করলেন? যদি জানতে চাও, তাহলে পড়ে ফেল আশাপূর্না দেবীর গল্প সংকলন 'পঞ্চাশটি কিশোর গল্প'।

পঞ্চাশটি কিশোর গল্প
আশাপূর্ণা দেবী
নির্মল বুক এজেন্সি
মূল্য-আশি টাকা

দেশে-বিদেশে

শিবঠাকুরের আপন দেশে

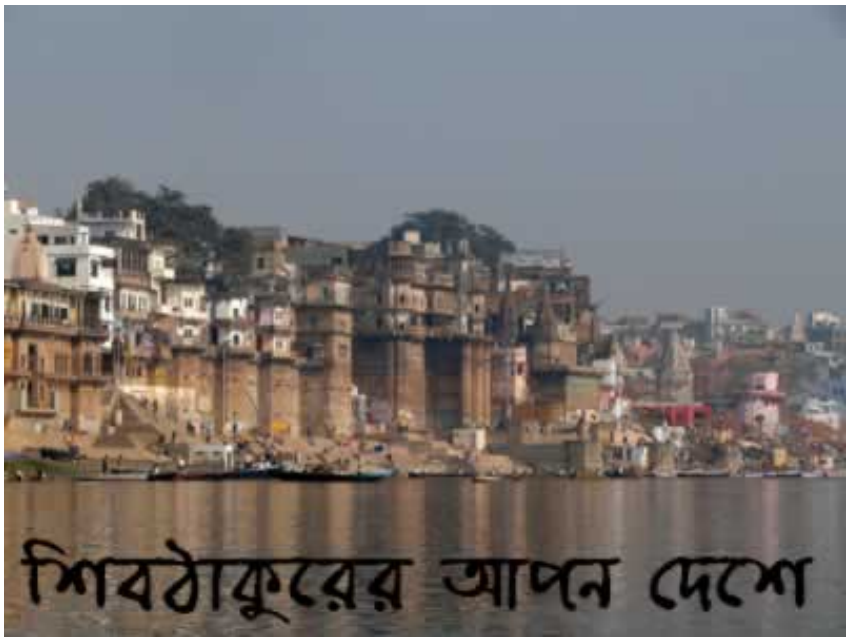

'জয় বাবা ফেলুনাথ' দেখেছ কি? না দেখে থাকলে শিগগির দেখে ফেল। ফেলুদা, তোপসে, জটায়ুর সাথে ক্যাপ্টেন স্পার্ক মিলে সমাধান করে ফেলে এক জটিল রহস্যের, আর পাকড়াও করে ফেলে দুষ্টু চোরাকারবারি মগনলাল মেঘরাজকে। এই ছবিতে অবশ্য ফেলুদা কোম্পানি ছাড়াও আরেকটা দেখার বিষয় আছে। সত্যি বলতে কি, 'জয় বাবা ফেলুনাথ' জুড়ে অর্ধেকটা যদি হয় ফেলুদা কোম্পানি, তাহলে বাকি অর্ধেক জুড়ে আছে এই গল্পের পটভূমি- বেনারস বা বারানসী। বেনারসের অলি-গলি, ঘাট, বাঙ্গালি হোটেল, গঙ্গা নদী, পুরোনো মহলবাড়ি- সব মিলে মিশে তৈরি করেছে এই জনপ্রিয় থ্রিলারের পটভূমি।

এই বেনারসে বেড়াতে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল গত শীতে। বেনারস সম্বন্ধে আগ্রহ তো আর শুধু 'জয় বাবা ফেলুনাথ' এর কারনে নয়। এই ছবিটি ছাড়াও অন্য অনেক ভালোলাগা ছবি ও গল্পেতে ফিরে এসেছে বেনারস।যেমন অনেকখানি এসেছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'অপরাজিত' উপন্যাসে। যে গল্প নিয়ে আবার পরে ছবিও তৈরি করেছেন সত্যজিত রায়। সে ছবিতেও প্রথমদিকে বেনারসের অলি-গলি-ঘাটের দৃশ্য অনেক রয়েছে। তাই সেই বেনারস যাওয়ার সুযোগ পেয়ে বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠলাম আর ক্যামেরা, আই-পড, সোয়েটার, চাদর ব্যাগে পুরে একদিন সন্ধ্যায় বেশ কয়েকজন বন্ধু মিলে রওনা দিলাম ট্রেনে চেপে।

জানো তো, বারানসী বা বেনারস হল পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন নগরী, যেখানে গত সাড়ে তিন হাজার বছরের মত সময় ধরে মানুষ বিরামহীন ভাবে বসবাস করে চলেছে (continually inhabited city)। প্রাচীনকালে এই নগরের নাম ছিল কাশী। কাশী শব্দের মানে হল -"আলোকিত স্থান"। প্রাচীণকালে কাশী ছিল শিক্ষা, ধর্ম, জ্ঞানের পীঠস্থান। গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত এই নগরের দুই পাশে

রয়েছে বরুণা ও অসি নদী। অনেকের মতে, এই বরুণা ও অসি মিলিয়েই এই নগরের নাম হয়েছে বারানসী। ভারতীয় ইতিহাসের আদি যুগে, কাশী ছিল ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য। শুধুমাত্র হিন্দু নয়, বৌদ্ধ ও জৈনদের কাছেও কাশী এক গুরুত্বপূর্ন পীঠস্থান।

ঘাটের আটকোনা চাতালে বসে কারা? তোপসে আর লালমোহন বাবু নাকি?

এইসব পড়াশোনা করে খুব আনন্দে সকাল বেলা ট্রেনের জানালা খুলে বসেই হটাত দেখতে পেলাম সেই ছবি - রেলের পুলের নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা নদী, আর তার পশ্চিম পাড় বরাবর দাঁড়িয়ে সেই প্রাচীণ নগর- মন্দির, মহল আর একের পর এক ছোট-বড় ঘাট।

বারানসী রেল স্টেশন থেকে নদীর ঘাট এবং বিশ্বনাথের মন্দির বেশ দূরে। রিকশা করে যেতে হয়। রাস্তায় প্রচুর মানুষ এবং অসংখ্য যানবাহন, পায়ে হেঁটে এপাশ থেকে ওপাশ যাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য। সেই যে একটা কবিতা আছে -'শিবঠাকুরের আপন দেশে/আইনকানুন সর্বনেশে' - একেবারে সেই অবস্থা! রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ আছে, ট্রাফিক সিগন্যাল ও আছে, কিন্তু সেইসব আইনকানুনের পরোয়া কেউ খুব একটা করে বলে মনে হয়না!

এই সর্বনেশে আইনকানুন না মানা রাস্তাঘাট পেরিয়ে, গোধুলিয়ার মোড় ছাড়িয়ে, বাঁহাতে বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরের তোরন ফেলে এগিয়ে, রিক্সা থেকে আমরা যেখানে নামলাম, সেটা দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছাকাছি। আমি অবশ্য তখনও বুঝি নি সেটা। সেখান থেকে আমার বন্ধুরা আমাকে নিয়ে চললো হোটেলের দিকে। তার জন্য আমরা ঢুকলাম একটা সরু গলির মধ্যে। গলির দুইদিকে নানারকমের দোকান - পান- মিষ্টি-জামাকাপড়-ক্যাসেট-বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি;দোকানগুলি সবই প্রায় দুই-তিন তলা বাড়ীর একতলায়। ফলে গলির মধ্যে রোদ্দুর প্রায় ঢোকেই না। গলিটা মাঝে মাঝে এত সরু যে ওপাশ থেকে একটা স্কুটার বা সাইকেল এলে একদম ধার ঘেঁষে দাঁড়াতে হচ্ছে। আর কি ভীষণ নোংরা!! আমি তো ভাবছি-আরেকটু এগোলেই মনে হয় পরিষ্কার বড় রাস্তা আসবে। ও হরি- কোথায় কি! এ যে পুরো সেই সুকুমার রায়ের ছড়াটার মত -অলি-গলি-চলি-রাম...ডানদিকে-বাঁদিকে বেঁকে চলেই চলেছে, চলেই চলেছে- মাঝে মাঝে এদিক ওদিক থেকে আরো গলি বেরিয়ে গেছে। আসলে আমি তখন

হাঁটছিলাম কাশীর বিখ্যাত বাঙ্গালিটোলার ভেতর দিয়ে। চলতে চলতেই একসময়ে চোখ চলে গেল একটা বাড়ীর দেওয়ালে লাগানো একটা নীল রঙের ফলকের ওপর সাদা দিয়ে লেখা নামের দিকে -

বেনারসের বাঙ্গালীটোলায় বাংলায় লেখা গলির নাম

একই সঙ্গে খুব আনন্দ আর উত্তেজনা অনুভব করেছিলাম। বাংলা থেকে এত দূরে, উত্তর প্রদেশে, যেখানে বেশিরভাগ মানুষ হিন্দি ভাষায় কথা বলেন, সেখানে একটা গলির নাম বাংলা অক্ষরে লেখা আছে! আর মজার কথা কি জানো- ওই বাড়ীটার ঠিক উল্টোদিকে একটা ছোট্ট রেস্তোঁরা আছে। খুবই সাদামাটা, গুটিকয়েক কাঠের চেয়ার টেবল পাতা। সেই রেস্তোঁরায় কিন্তু সাদা ভাত-ডাল-রুটির সাথে চাইনিজ-কোরিয়ান-স্প্যানিশ-কন্টিনেন্টাল-লেবানিজ সব রকমের খাবার পাওয়া যায়! ওই দোকানের দেওয়ালে চীনা-কোরিয়ান-ফরাসী-স্পেনীয় ভাষায় খাবারের মেনু আর দাম ও লেখা আছে। একই সঙ্গে এতগুলো ভাষাকে পাশাপাশি দেখে খুব অদ্ভুত লেগেছিল - ঠিক যেন সারা পৃথিবীটাই ছোট্ট হয়ে ঐটুকু জায়গার মধ্যে এসে গেছে!

বেনারসের আসল মজা হল বাঙ্গালীটোলার গলি গুলির মধ্যে, আর ঘাটগুলিতে। বেনারসে বড় ছোট

মিলিয়ে আশিটি ঘাট আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত দশাশ্বমেধ আর মণিকর্ণিকা। এছাড়া আছে মানমন্দির ঘাট, রানা মহল ঘাট, হরিশচন্দ্র ঘাট, চৌষট্টি ঘাট, রাজা ঘাট...। প্রত্যেকটা ঘাটের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে একেকটা করে গল্প। যদি একটা নৌকায় উঠে বস, তাহলে মাঝিভাই তোমাকে একের পর এক ঘাটের পাশ দিয়ে নিয়ে যাবে আর তাদের গল্প বলতে থাকবে -কোন গল্প সেই প্রাচীনকালের, কোনটা বা আবার একদম এই যুগের...

ভোরের কুয়াশা মাখা দশাশ্বমেধ ঘাট- বারানসীর সবথেকে জমজমাট ঘাট

মানমন্দির ঘাট- এই ঘাট তৈরি করিয়েছিলেন রাজা সওয়াই মান সিং। এখানে একটি ছোট অবসারভেটরি আছে।

বাবুয়া পান্ডে ঘাট-এটা হল ধোপাদের ঘাট। বাবুয়া পান্ডে নামের একজন মানুষ, যিনি নিজে পেশায় ধোপা ছিলেন, তিনি এই ঘাটকে দান করে যান সব ধোপাদের ব্যবহারের জন্য। এখানে রোজ সকালে গেলে দেখতে পাওয়া যায় কত মানুষ সার দিয়ে কাপড় কেচে-ধুয়ে পরিষ্কার করছেন।

এইসব ঘাটে ওঠা-নামার জন্য সিঁড়িগুলি কিন্তু খুব উঁচু উঁচু - তাই উঠতে নামতে গেলে প্রথমদিকে কিন্তু খুব পায়ে ব্যথা করতে পারে!

ঘাটের উঁচু উঁচু সিঁড়ি, উঠতে উঠতে পায়ে ব্যথা!

দশাশ্বমেধ ঘাট হল বারানসীর সবথেকে জমজমাট ঘাট। খুব ভোরবেলা থেকে এখানে নানা মানুষের ভিড় জমে যায়। পুন্যার্থীরা এখানে স্নান সেরে বিশ্বনাথের মন্দিরে পুজো দিতে যান। এছাড়া ঘাটে থাকেন অনেক সন্ন্যাসি, কথক ঠাকুর, মালিশওয়ালা, নাপিত, ফেরিওয়ালা আর ভ্রমনার্থীর দল। নৌকার মাঝিরা সার বেঁধে সাজিয়ে রাখে রং-বেরং-এর নৌকা।

রংবেরং এর নৌকা, গেরুয়াবসন সন্ন্যাসী, গঙ্গাপুজোর উপকরন, বাঁশের ছাতা...এসব ছাড়া বারানসীর ঘাট অসম্পূর্ণ

বিকেলের দিকে এই ঘাট ভাল করে ধোয়া হয়। আর সন্ধ্যাবেলা এই ঘাটে হয় গঙ্গা আরতি। গান এবং শ্লোকের তালে তালে নানা রকমের উপাচার দিয়ে মা গঙ্গার আরতি করেন পাঁচজন পুজারী।

সন্ধ্যাবেলা দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গা আরতি

বারানসীর বিখ্যাত জিনিষগুলি কি কি বলতো? - আচ্ছা, আমিই বলি - কাঠের খেলনা, কাঁচের চুড়ি, বেনারসী শাড়ী, বেনারসী পান, রাবড়ি, প্যাঁড়া, পাথরের থালা-গেলাস...এইসমস্ত জিনিষ যদি একসঙ্গে দেখতে এবং কিনতে চাও, তাহলে কিন্তু বিশ্বনাথের গলিতে ঢুকতেই হবে। বিশ্বনাথের গলি মানে হল যে গলির শেষে বাবা বিশ্বনাথের মন্দির আছে। তা বলে মোটেও ভেবো না সেটা কোন ছোটখাটো গলি। আসলে বিশ্বনাথের মন্দিরের চারিপাশেই অনেকগুলি গলি আছে, এবং সে এক বড় মজাদার গোলোকধাঁধা। কি নেই সেখানে! এইসব নানারকমের চোখ ধাঁধানো জিনিষের সাথে কিন্তু রয়েছে গলিতে যত্র-তত্র দাঁড়িয়ে থাকা ষাঁড় আর দোকান এবং মন্দিরের মাথায় লাফ-ঝাঁপ দিয়ে বেড়ানো হনুমানের দল। ষাঁড় কিনা বাবা বিশ্বনাথের বাহন, আর হনুমান তো নিজেই পূজনীয়, তাই এদেরকে কেই কিছু বলেনা। তবে বেনারসের গলির ষাঁড়েরা খুবই শান্ত, তারা বিশেষ কাউকে কিছু বলে না। কিন্তু হনুমানেরা ভয়ানক দুষ্ট, ঘরের দরজা খোলা থাকলে কিন্তু ঘরে ঢুকে জিনিষপত্র লন্ডভন্ড করে দেবে, বা মন্দিরের পথে প্রসাদের ঠোঙ্গা কেড়ে নেবে!!

ষাঁড়,রাবড়ি, কাঁচের চুড়ি, হনুমান... এই সব কিছু নিয়েই বারানসী

একদিন বিকেলবেলা আমরা ঘুরতে গেলাম সারনাথ। সারনাথ হল সেই জায়গা, যেখানে ভগবান বুদ্ধ প্রথম তাঁর বানী প্রচার করেছিলেন।

ভগবান বুদ্ধের প্রথম বানী লিখে রাখা আছে এই ফলকে

সারনাথে বেশ কয়েকটী বৌদ্ধ মন্দির আছে। আছে একটি বিশাল স্তূপ। কথিত আছে, ওই স্তূপের ভেতরে সম্রাট অশোক ভগবান বুদ্ধের দেহাবশেষ রেখেছিলেন।

ভগবান বুদ্ধের দেহাবশেষ রক্ষিত আছে এই স্তূপে ভেতর।

সারনাথের আরেকটি দ্রষ্টব্য হল ভারতীয় প্রত্নতত্ব বিভাগের একটি সংগ্রহশালা। এই সংগ্রহশালা বা মিউসিয়ামের বিশেষ আকর্ষণ হল অশোক স্তম্ভ। হ্যাঁ, আমাদের দেশের জাতীয় প্রতীক অশোক স্তম্ভ সুরক্ষিত আছে এখানে। তার সঙ্গে আছে বৌদ্ধ এবং হিন্দু (মৌর্য, গুপ্ত ও কুষাণ) যুগের নানান শিল্প নিদর্শন। আছে বোধিসত্বের নানান অপূর্ব মূর্তি।

সারনাথ মিউসিয়াম বা বিশ্বনাথের মন্দিরে ক্যামেরা বা মোবাইল ফোন নিয়ে ঢোকা বারন। তাই এইসব জায়গার ছবি তোলা যায়নি।

যেদিন চলে আসব, সেদিন সকালে খুব মজা হল। তিন-চার দিন কুয়াশা থাকার পর সেদিন আকাশ পরিষ্কার হয়ে ঝকঝকে সোনালি রোদ্দুর উঠলো।

নদির বুকে সোনালী আলো

আমরা সবাই নৌকা চেপে গঙ্গায় বেড়াতে গেলাম। মাঝনদীতে পাশে এলো আরেকটি নৌকা। সেই নৌকার মাঝি বিক্রী করছিল সেউভাজা। কেন বলতো? - নদীর বুকের ওপর পাক খেয়ে বেড়ানো পরিযায়ী পাখিদের কাছে ডাকার জন্য ঐ সেউভাজা হল টোপ। যেই আমরা জলের ওপর সেউ ছড়িয়ে ডাক দিলাম- আ-আ-আ...

অমনি দূর থেকে কলরবলর করতে করতে আমাদের দিকে ঝাঁকে ঝাঁকে ধেয়ে এল রাশি রাশি সী-গাল, ঘুরপাক খেতে লাগলো আমাদের নৌকার আশেপাশে, ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে, আবার ধেয়ে উঠে গেল আকাশে!

সীগাল দের সাথে

বেশ খানিক্ষণ সী-গাল দের সঙ্গে খেলা করে আমরা ফিরে এলাম অনেক বেলায়।

বারানসীর আরো দুটি দ্রষ্টব্য জায়গা হল রামনগর রাজবাড়ী আর বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া আছে অসংখ্য ছোট বড় মন্দির। সব জায়গা আমার নিজেরই ঘোরা হয়নি। যে প্রাচীন নগরীর পরতে পরতে, আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে এত এত গল্প, তাকে কি মোটে চার-পাঁচ দিনে চিনে ওঠা যায়? তাই আমি সুযোগ পেলে আবার বেড়াতে যাব বারানসী। খুঁজে নেবো আরো অনেক গল্প, লোককথা আর পুরানকথা। আর আবার সন্ধেবেলা নৌকায় চেপে বেড়াতে বেড়াতে নিজের মনের ইচ্ছা চুপি চুপি ভগবানকে জানিয়ে দিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেব আলোর প্রদীপ...

লেখা ও ছবিঃ
মহাশ্বেতা রায়

পাটুলী, কলকাতা

লাস ভেগাস

একদল স্প্যানিশ ব্যবসায়ী চলেছে লস এঞ্জেলেস এর দিকে। সাল ১৮২৯। তাদের লক্ষ - যত তাড়াতাড়ি লস এঞ্জেলেস এ পৌঁছানো যায়। লস এঞ্জেলেস থেকে তারা এখনও ৩০০ মাইল দূরে। দলের নেতা আন্তোনিও। তার দলটা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে একটানা চলছে। দলের সবাই পরিশ্রান্ত, জল তেষ্টা আর খিদেতে সবাই ক্লান্ত। এভাবে চলতে থাকলে দলের অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়বে, এমনকি মারাও যেতে পারে। কিন্তু চারিদিকে যতদূর দেখা যায় ধু-ধু মরুভূমি - শুধু ক্যাক্টাস আর কাঁটা গাছ, রুক্ষ প্রান্তর। দলের বাকিদের সঙ্গে পরামর্শ করে আন্তোনিও ঠিক করলো এখানেই তাঁবু ফেলবে। দলের সাহসীদের দুটো দলে ভাগ করে দিয়ে পাঠালো দুই দিকে জলের সন্ধানে। দলের এক সাহসী সহ-নেতা, রাফায়েল ঠিক করলো সে দক্ষিণ-পশ্চিমে জলের খোঁজে যাবে। সে শুনেছে কাছাকাছি একটা মরুদ্যান আছে- যেখানে জল অফুরন্ত, গাছের পাতা সবুজ- যেখানে কান পাতলে এই রুক্ষ পরিবেশেও শান্তির বাতাস বয়ে যায়।

এর পরের ঘটনায় দক্ষিণ-পশ্চিম আমেরিকার ব্যবসায়ী ইতিহাস সম্পূর্ণ বদলে গেলো। যে রাস্তা দিয়ে আন্তোনিও যাচ্ছিল, তার নাম স্প্যানিশ ট্রেইল। ব্যবসায়ীরা স্প্যানিশ ট্রেইল ব্যবহার করে নিউ মেক্সিকো থেকে লস এঞ্জেলেস অবধি যেত তাদের পসরা নিয়ে। এই পথ ছিল রুক্ষ মরুভূমি, সুউচ্চ পর্বতমালা এবং গভীর গিরিখাতের মধ্য দিয়ে।রাফায়েল মরুদ্যান খুঁজে পেল, তার ফলে তারপর থেকে সব ব্যবসায়ীরা এই মরুদ্যানের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত শুরু করলো। স্প্যানিশ ট্রেইলের নতুন রাস্তা হল মরুদ্যানের মধ্য দিয়ে। স্প্যানিশরা এই জায়গাটার নাম দিল 'লা ভেগা' ; যা বাংলা করলে দাঁড়ায়

'তৃণভূমি'। সেই জায়গাটাই আজকের লাস ভেগাস। মরুভূমির দেশে মরুদ্যান।

স্প্যানিশ ট্রেইল

১৮৩০ সালের সেই মরুদ্যান এর থেকে আজকের লাস ভেগাসের চেহারা সম্পূর্ণ আলাদা। পৌনে দুশো বছরের মধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। এক সময়ে এই মরুদ্যান দুষ্ট লোকেদের আড্ডা হয়ে গেছিল। হেন অন্যায় কাজ নেই যা হতোনা। এমন অবস্থা ছিল যে পুলিশরাই ভয়ে ভয়ে ঐখান দিয়ে যেত। আজ লাস ভেগাসের চেহারা বদলে গেছে। স্টেফী গ্রাফ আর আন্দ্রে আগাসির বাড়ী এখানে। আরো অনেক নামি-দামী মানুষ এখানে বাড়ী নিয়ে আছেন।

তবে আমরা নামি-দামীদের কথা বলবো না আজ। আমরা যাব সেইসব জায়গায় যেখানে টুরিস্টরা ঘুরতে যায় বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত স্থপতিরা লাস ভেগাসে ভিড় জমিয়েছেন, তাঁদের তৈরি হোটেল আর হোটেলের কারুকার্য হাঁ করে দেখতে হয়। সমস্ত নামি-দামি শিল্পীরা এখানে আসেন তাঁদের শিল্পকলা প্রদর্শন করতে। দুই থেকে তিন বর্গমাইলের মধ্যে একটার পর আরেকটা হোটেল। চলো, আমরা হোটেল গুলোর সৌন্দর্য দেখি। এই লেখার সংগে ছবিগুলি আমার স্ত্রী পিউ আর আমার তোলা। পিউএর বাবা- মা, পিউ আর আমি একসঙ্গে বেড়াতে গেছিলাম, নেভাডায় অবস্থিত লাস ভেগাসে।

প্রথমেই দেখাই রাতের লাস ভেগাস শহরের ছবি। চারিদিকে শুধু আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে।

আমরা সন্ধেবেলা যখন শহরটায় ঢুকছি, তখন সেই একশো বছর আগের ব্যবসায়ীদের মত আমরাও মরুভূমির মধ্য দিয়ে গেলাম। রাস্তাতে লেখা আছে পরবর্তী আশি মাইল কোন পেট্রল পাম্প নেই, তাই সবাই যেন গাড়ীতে তেল ভরে তবে মরুভূমির মধ্যে গাড়ী চালানো শুরু করে। আমরা ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে চললাম এক ঘন্টারও বেশি। হটাত, একেবারেই হটাত একটা বাঁক নিতেই মনে হল আমাদের চোখ যেন ধাঁধিয়ে গেল। যদিও শহর তখনো দূরে,কিন্তু আলোর ছটা তিরিশ মাইল দূর থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

আমরা প্রথমে গেলাম আমাদের হোটেলের দিকে- হোটেল স্ট্রাটোস্ফিয়ার। ওই যে হোটেলের মাথায় লাল অ্যান্টেনার মত উঠে আছে, ওটা আসলে একটা মজার জায়গা। ওটা একটা রাইড। নাগরদোলার মত চাপতে হয়। চাপলে রাইডটা সোজা ওপরে নিয়ে গিয়ে হটাত করে ছেড়ে দেয়! ভাবো তুমি শূণ্যে ভাসমান অবস্থায় সোজা নিচের দিকে নামছো!! নিজেকে ভারহীন মনে হয় তখন! সারা শরীর সিরসির করে তখন, কিন্তু খুব মজাও লাগে।

ওখাণে আবার প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের আদলে একটা হোটেল আছে। আরো একটা মজার ব্যাপার হল - ছবিটায় দেখবে ফোয়ারার জল কত উঁচু অবধি উঠে গেছে।

এই জায়গা বেলাজিওর সামনে। ওখানে প্রত্যেক পনেরো মিনিট অন্তর ফোয়ারার খেলা হচ্ছে। গানের তালে তালে জল শূণ্যে লাফিয়ে উঠছে। ভিড় দেখে বুঝতে পারবে কত লোক দেখতে আসে। চারিদিকেধু ক্যামেরার শাটার আর ফ্লাশের ঝলকানি। সন্ধ্যেবেলা থেকে শহরটাকে মনে হবে এক মায়াময় জগত, যেখানে আঁধার নামলেই আলো ঝলমল করে ওঠে। ফোয়ারা গানের তালে তালে তিরিশ তলা অবধি নাচছে। চারিদিকে হাসি-গল্পের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তারপর চোখের সামনে একটা খুব উজ্জ্বল আলোর শিখা উঠে গেলো আকাশ অবধি। সেটা উঠলো একটা হোটেলের মাথা থেকে। এই হোটেলটা দেখতে পিরামিডের মত। নাম লাক্সর হোটেল। এই আলোর জোর এত যে আড়াইশো মাইল দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়।

আর লাস ভেগাস লেখা নিয়ন আলোটা সবাইকে আমন্ত্রন জানাচ্ছে লাস ভেগাসে আসার জন্য।

এবারে যাই ফ্রিমন্ট স্ট্রীট বলে একটা জায়গা। ফ্রিমন্ট স্ট্রীট হল পুরোনো দিনের লাস ভেগাস। আজও

এখানে নিয়মিত শো হয়, অনেক সময় রাস্তায়ও শো হয়।ফ্রিমন্ট হোটেল, গোল্ডেন নাগেট তখনকার দিনের বিখ্যাত হোটেল।

এতক্ষন ঘুরে ক্ষিদে পেয়ে গেলে থামতে হবে চকোলেটের ঝরনার সামনে। সত্যি চকোলেট ঝরনা হয়ে গড়িয়ে আসছে। দেখলেই জিভে জল এসে যাবে।

পরের দিন আমরা দিনের বেলা বাকি হোটেল গুলো ঘুরে দেখলাম।প্রথমেই চোখে পড়বে হারাস- সোনা রঙের জোকাররা যেখানে বিভিন্ন সাজে আছে।

তারপর সীজার'স প্যালেস, যেখানে সব কিছু জুলিয়াস সীজারের প্রাসাদের অনুকরণে তৈরি।

তারপর ট্রেসার আইল্যান্ড এর সামনে জলদস্যুদের খেলা...

হোটেল দ্য মিরাজ -এর সামনে জলের তলা থেকে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুতপাত।

এরপর ইতালির ভেনিস শহরের আদলে তৈরি ভেনেশিয়ান। ভেনিস শহরে যেমন গন্ডোলা করে সবাইকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, এখানেও সেরকম গন্ডোলা ফেরি নিয়ে যায়। গোটা হোটেলটার মধ্যে পরিখা বানানো আছে। ছবি দেখে বলতো, আকাশটা আসল, নাকি নকল?

এই হল আজকের লাস ভেগাস- নিরন্তর আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠার, অবাক হয়ে মানুষের সৃষ্টি দেখার জায়গা- কোনও হোটেলে বড় শিল্পীর কাজের প্রদর্শনী চলছে, কোথাও সাদা বাঘের খেলা চলছে, কোথাও বা গানের তালে তালে ডলফিন জল থেকে লাফিয়ে উঠছে। এইসব দেখে শুনে আমরা ক্লান্ত হয়ে ঘরে এসে শোবার তোড়জোড় শুরু করলাম। পরের দিন বাড়ি ফিরতে হবে যে!

এখন শীত। আমি কাজের সূত্রে আছে নায়গ্রা ফলস্ থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে। এখানে বরফ পড়া শুরু হয়ে গেছে। শুনেছি এখানে নাকি শীতে খুব ঠাণ্ডা পড়ে। এত ঠাণ্ডার জায়গায় আমি এই প্রথম থাকছি। তোমাকে পরের বারে জানাবো কেমন শীত কাটালাম নায়গ্রার সাথে।

লেখা ও ছবিঃ
দেবাশীষ পাল
ওকলাহোমা সিটি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

ছবির খবর: দুপায়ের ঘোড়া

তুমি কি কখোনো দুপায়ের ঘোড়া দেখেছো?

আমি অন্তত দেখিনি।

চোখের সামনে একটা দুপায়ের ঘোড়া টাঙ্গা টেনে নিয়ে যাচ্ছে এমন ছবি আমাদের মনে হয় কারো সংগ্রহে নেই।পাড়া পড়শিদের সাথে কিম্বা বন্ধু মহলে তুমি যদি এইসব নিয়ে কথা বলো তাহলে বন্ধুরা ভাববে তুমি টাইমপাস করছো...ইয়ার্কির একটা জায়গা থাকে। কিন্তু আমি যদি তোমাকে নীচের ছবিটার দিকে তাকাতে বলি...একটু ভালো করে দেখোতো ছবিটা...

একটা ছেলের মুখে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে লাগাম। তার মুখ যন্ত্রনায়...কষ্টে...লাল হয়ে উঠেছে। ঠিক তার পরের ছবিটা দেখো...মন দিয়ে দেখো কিন্তু...

একপাল ঘোড়ার মধ্যে সে পিঠে একজন সওয়ারী নিয়ে দৌড়ে নেমেছে। একটা মানুষ আস্তে আস্তে ঘোড়ায় পরিণত হচ্ছে। জন্তুতে রূপান্তরিত হচ্ছে মানুষ।

যে ছবি গুলো দেখলাম সেগুলো একটা ফিল্মের। তার নাম 'Two-Legged Horse' বা 'দুপায়ের ঘোড়া'।২০০৮ সালে এই ছবিটি তৈরি করেছেন ইরানের চিত্রপরিচালক সামীরা মাখমালবাফ। সামীরার নাম শুনেছ কি? সামীরা হলেন পৃথিবীর সবথেকে কমবয়সী চিত্রপরিচালকদের একজন।১৯৮০ সালে তাঁর জন্ম। তিনি খুব ছোটবেলা থেকে ফিল্ম নিয়ে পড়াশোনা করেন। আজ পর্যন্ত তিনি মোটে পাঁচটি ছবি ও তথচিত্র বানিয়েছেন - সেগুলি সবগুলিই কিন্তু নানাকরম আন্তর্জাতিক পুরষ্কারে সম্মানিত হয়েছে।

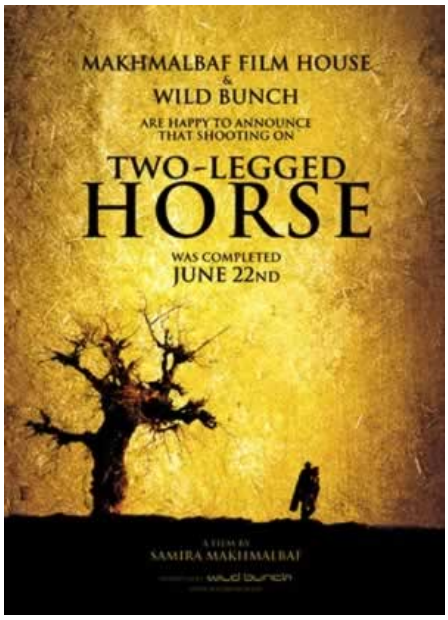

একদিন সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর সামীরা তার বাবার কাছ থেকে একটা চিত্রনাট্য পান। বাবা বিখ্যাত পরিচালক মহসিন মাখমালবাফ সারা রাত ধরে এই চিত্রনাট্য লিখেছেন। সামীরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে একবারে পড়ে ফেলেন লেখাটা। কিন্তু এটা লিখেছেন তাঁর বাবা? এত কষ্ট...এত যন্ত্রণা...এত দুঃখ এই ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়ে গুলোর।

"এটা কেমন গল্প আর চিত্রনাট্য বাবা?"সামীরা প্রশ্ন করেন। একটা ছেলে যে মানসিক এবং শারিরীকভাবে প্রতিবন্ধি সে আস্তে আস্তে ঘোড়ায় পরিণত হচ্ছে তার চেয়ে বয়সে একটু কম আরো একটা প্রতিবন্ধি ছেলেকে স্কুলে নিয়ে যেতে গিয়ে। তার তো সারাদিনের রোজগার মোটে এক ডলার। তার জন্য এত কষ্ট?

বাবা তাঁর সেই খুব অল্প বয়সে পরিচালক হওয়া মেয়েকে বলেছিলেন "চারপাশটা দেখো...তোমার কি মনে হচ্ছে আমরা সবাই ঠিক আছি? যদি মনে হয় ওই ছেলেটা ভুল...ওর কষ্টটাও তাহলে এই ছবিটা কোরো না।" সামীরা বেশ কিছুদিন ভেবে ছিলেন ছবিটা নিয়ে তারপর একদিন অভিনেতা অভিনেত্রী ঠিক করা শ্যুটিং এর আরো অনুষঙ্গ কাজে মন দিলেন।নিরন্তর পরিশ্রমের পর আমরা তাঁর কাছ থেকে উপহার পেলাম 'টু লেগড হর্স'।

আফগানিস্তানের এক গন্ড গ্রাম। যেখানে সভ্যতার আঁচটুকু লাগেনি সেইরকম গ্রামে এই গল্পের সূত্রপাত। যুদ্ধ...দাঙ্গা...অভ্যন্তরীণ কলহে দীর্ণ একটা দেশের এক অসহায় অঞ্চলের ছোট্ট ছেলে মেয়েদের কথা আমাদের সামনে বলতে বসলেন সামীরা।কী দেখলো সামীরার ক্যামেরা? দেখলো পরিতক্ত্য বাঙ্কারের মধ্যে থাকে অগণিত বাচ্চা। যাদের মা বাবা কেউ নেই...যারা সবাই বিগত যুদ্ধে মারা গেছেন।যে সব বাচ্চারা রোজ দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না। তাদের সামনে এক অবস্থাপন্ন বৃদ্ধ আফগান এসে একটা প্রস্তাব রাখেন। একটা সুস্থ সবল ছেলে চাই। কাজ আছে। কাজ করতে পারলে দৈনিক এক ডলার।

সবাই পরীক্ষার জন্য হাজির হয়। একটা ছেলেকে তার মধ্যে থেকে পছন্দ করেন বৃদ্ধ। যে তাঁর ছেলেকে পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যাবে স্কুলে...বাজারে...খেলার মাঠে। সর্বক্ষণের সঙ্গী হবে সে।কিন্তু যে ছেলেটাকে বাছা হয় সেও তো শারিরীক নানা অক্ষমতার শিকার। যে পিঠে নিলো আর যে পিঠে উঠলো তারা যেন একই মেরুর বাসিন্দা হয়ে দুজন কত দূরের। একজনের কেউ নেই আর এক জনের বাবা আছে...বোন আছে...অর্থ আছে কিন্তু তার পা দুটো নেই...মা নেই...এইসব হারিয়েছে সে যুদ্ধে। তারা দুজনে কখোনো বন্ধু আবার কখোনো মনিব-ভৃত্য।

কিন্তু এই সম্পর্ক খুব একটা বেশি দিন মধুর থাকে না। মনিবের নানা রকম খেয়ালী উদ্ভট খেলায় শরিক হতে হয় দুপায়ের ঘোড়াটকে। মনিব শুধু নয় তার বন্ধুদেরও চড়াতে হয় পিঠে।সবাই তো সত্যিকারের ঘোড়ার পিঠে চড়ে...কিন্তু মানুষ ঘোড়া। চড়েছে কেউ? সে এবার ভাড়া খাটায় তার ঘোড়াকে। আর সেই ছেলেটা যার ছবি তুমি দেখেছো প্রথমে...লাগাম মুখে দিয়ে সে আস্তে আস্তে যন্ত্রণায়...ঘেন্নায়...কষ্টে... কুঁকড়ে যেতে থাকে। তার এই কষ্টের নীরব দর্শক থাকে এক ছোট্ট মেয়ে। যে গ্রামের রাস্তায় ভিক্ষে করে। যার কথা আমরা একটুও জানতে পারি না, যে কোনো কথা বলে না। শুধু হাত বাড়িয়ে থাকে ভিক্ষার। আর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা কান্না।

যারা ইস্কুলে যায় আমরা তাদের কথা জানতে পারি। যাদের ছোট্টবেলাটা ধ্বংস করে দিয়েছে বড় বড় মানুষদের যুদ্ধ, যাদের বাবা-মা হারিয়ে গেছে, বাড়ি ঘর ভেঙ্গে গেছে, যারা স্কুলে যায় না, খাওয়ার জন্য যাদের ছোট্টবেলা থেকে কাজ করতে হয়, তাদের কথা আমরা কজন জানতে পারি বা মনে রাখি?

শেষ পর্যন্ত ছেলেটার চাকরী থাকে না। কোনো একদিন প্রবল এক শীতের সকালে পরিতক্ত্য বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে সে দেখে আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে পরিযায়ী পাখিরা।
তারা যাচ্ছে শীতের দেশ ছেড়ে উষ্ণতার দেশে।

কিন্তু এই ছেলেটা কোথায় যাবে? কোন দেশে? তার তো কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই!

কল্লোল লাহিড়ী
উত্তরপাড়া, হুগলী

ছবিঃ
মাখমালবাফ

বায়োস্কোপের বারোকথা: স্টুডিও ব্যবস্থা

ধীরে ধীরে ছবির বাজার, ছবি দেখানোর মানচিত্র যতই ছড়িয়ে পড়তে লাগলো, ততই ছবি বানানোর প্রক্রিয়াটি অগোছালো ও ব্যক্তিনির্ভর হওয়ার বদলে পৃথিবীর সব দেশেই কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান তৈরি করলো- এরা অনেকটা কারখানার মত, যেখানে সমবেত উদ্যোগে কোন জিনিষ তৈরি হয়। সিনেমার জগতে এদেরই স্টুডিও বলে। আর এই স্টুডিও অনেকটাই মোটরগাড়ীর কারখানার নিয়ম অনুসরন করে স্থাপনা করা হল। সুতরাং হলিউডের স্টুডিও ব্যবস্থার মধ্যেও খানিকটা অ্যাসেম্বলি লাইন, অর্থাৎ টুকরো টুকরো জিনিষ বানিয়ে জুড়ে দেওয়ার রীতি শুরু হল।

স্টুডিও নামটির মধ্যেই কেমন একটা মিশ্র পদ্ধতির ইঙ্গিত আছে। তার খানিকটা শিল্পকলার, খানিকটা শিল্পোদ্যোগের। চিত্রশিল্পীরা স্টুডিওতে ছবি আঁকতেন; কিন্তু সিনেমার স্টুডিও অনেকটা সাবান, কলম, জুতো তৈরি করার মত ব্র্যান্ডনেম তৈরি করতে শুরু করে। যেমন লোকে বলতো অমুক স্টুডিওর ছবি...সত্যজিত রায় নিজেও বলেছেন যে তাঁর কৈশোরে তিনি কলম্বিয়ার ছবির থেকে প্যারামাউন্ট এর ছবি কিভাবে আলাদা হয়, সেটা জানতে খুব কৌতুহলী ছিলেন।

পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই এইরকম স্টুডিও ব্যবস্থা ছিল- যেমন ইতালিতে চিনেচিত্তা, জার্মানীতে উফা, বা আমাদের কলকাতায় নিউ থিয়েটার্স।

জার্মানির উফার লোগো, ইতালির চিনেচিত্তার প্রবেশপথ

এই স্টুডিওগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিল মেট্রো- গোল্ডউইন-মেয়ার, যাকে এম-জি-এম নামে আমরা সবাই চিনি। এদের এমনকি কলকাতা শহরেও নিজস্ব ছবিঘর ছিল -মেট্রো নামে। এখন তার হাতবদল

হয়েছে কিন্তু এসপ্ল্যানেডের মেট্রোকে আমরা সবাই চিনি, তাই না? এরা এতদূর দক্ষ ছিল যে তিরিশ দশকের মাঝামাঝি একটা পূর্ন দৈর্ঘ্যের ছবি বানাতে এদের লাগত মাত্র এক সপ্তাহ। সে যুগের হলিউডের বড় বড় পরিচালক ও অভিনেতা –অভিনেত্রীরা সবাই ছিল এদের কাছে দায়বদ্ধ। এরাই বিখ্যাত 'হলিউড রীতি'র ধারক ও বাহক ছিলেন। যেমন High Key Lighting – যাতে দৃশ্যগুলি উজ্জ্বল হত যা দেখতে দর্শকদের ভালো লাগতো।

যদি এমজিএম হয় মার্কিন স্টুডিও ব্যবস্থার সবচেয়ে মার্কিনি ছাপ, তবে প্যারামাউন্ট স্টুডিও উল্টোদিক থেকে সবচেয়ে ইউরোপীয়। এখানে যাঁরা কাজ করতেন তাঁরা অনেকেই জার্মানি থেকে এসেছিলেন। ফলে তাঁদের ছবি অনেক অন্যরকম হত– তাতে অনেক সময়ে থাকতো অন্ধকার আর রহস্যের আভাস।

প্যারামাউন্ট বলতেই আমাদের প্রথমেই মনে পড়ে সিসিল বি ডিমিল এর জাঁকজমকপূর্ণ ছবিগুলি। তার সাথেই মনে পড়ে লুবিত্জ এর ছবিগুলির কথা।

এমজিএম এর ছবিগুলি যদি মধ্যবিত্ত সমাজের গল্প শোনাতো, প্যারামাউন্ট যদি হয় একটু অন্য রকম ভাবনা চিন্তা করা দর্শকদের জন্য, তাহলে ওয়ার্নার ব্রাদার্স ছিল মোটামুটিভাবে সমাজের খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য। সেইজন্য এদের ছবিগুলিতে এইসব সাধারন মানুষদের মধ্যে জনপ্রিয় গানবাজনা এবং মেলোড্রামা থাকতো।

আমরা কলম্বিয়া এবং টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি ফক্স এর নামও করতে পারি; দ্বিতীয় স্টুডিওর সবথেকে নামকরা পরিচালক ছিলেন জন ফোর্ড। তিনি তৈরি করতেন ওয়েস্টার্ন ছবি।

এই স্টুডিও সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে সবথেকে ছোট ছিল আর কে ও নামে একটি প্রতিষ্ঠান।

আমেরিকার বিভিন্ন বড় –ছোট স্টুডিও গুলির লোগো

এইসব খুব বড় বড় স্টুডিওগুলির পাশাপাশি কাজ করতো অনেক ছোটখাটো স্টুডিও। যেমন ছিল ইউনাইটেড আর্টিস্টস্। এরাই প্রথম ড্রাকুলা, মাম্মি সিরিজ ইত্যাদি গা-ছমছমে রোমহর্ষক ছবিগুলি তৈরি করে। এছাড়া এই ইউনাইটেড আর্টিস্টস্ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকেই ছবি তৈরি এবং প্রচার করেছিলেন চ্যাপলিন, গ্রিফিথ, মেরি পিকফোর্ড এবং ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্ এর মত পরিচালক ও অভিনেতারা।

ওপরের সারি -আলফ্রেড হিচকক, জন ফোর্ড; নীচের সারি- মেরি পিকফোর্ড, সিসিল বি ডিমিল

আমাদের দেশে তিরিশ দশকে যারা ছবি তৈরি করতেন, তাদের মধ্যে কলকাতায় নিউ থিয়েটার্স, অরোরা ও ভারতলক্ষ্মী স্টুডিও, পুণের প্রভাত স্টুডিও এবং মাদ্রাজের চন্দ্রলেখা স্টুডিও খুব বিখ্যাত।

নিউ থিয়েটার্স ও প্রভাত স্টুডিওর লোগো

নাম জানা তো অনেক হল।এবার বরং জানা যাক সিনেমার সংসারে এইসব স্টুডিওদের অবদান কি ছিল। প্রথম এবং প্রধান অবদান ছিল শৃঙ্খলাপরায়নতা। পরিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং কলাকুশলীরা, সবাই নিয়ম মেনে নিজের নিজের কাজ করতো। একটা নিয়ম মেনে পরিচালনা পদ্ধতি

শুরু করার জন্যই ধীরে ধীরে হাওয়ার্ড হকস্, জন ফোর্ড, আলফ্রেড হিচকক এর মত পরিচালকরা তৈরি হন।

আমাদের দেশেও, স্টুডিও না থাকলে, সত্যজিত রায়ের আগের যুগের যারা বড় পরিচালক, যেমন দেবকীকুমার বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া, বা বিমল রায় তৈরি হতেন না।

বাঁদিকে- দেবকীকুমার বসু; ডানদিকে প্রমথেশ বড়ুয়া ও বিমল রায়

নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওই প্রথম বাংলা সাহিত্যের গল্পগুলিকে নিয়ে ছবি তৈরি করে, এবং সুন্দরভাবে এই গল্পগুলিকে বলার এক ধরন তৈরি করে। সেই যুগে, সিনেমা বানানোর জন্য নিত্য নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার আজকের দিনের মত এত বেশি ছিল না। কিন্তু স্টুডিও ব্যবস্থার মাধ্যমে সিনেমা যেভাবে গল্প বলতে শিখলো, সেই গল্প বলা দেখে এবং শুনে সিনেমাকে আরো বেশি ভালবাসলো সারা পৃথিবীর মানুষ।

সময়ের সাথে এই স্টুডিও ব্যবস্থা একদিন ভেঙ্গে গেল, কিন্তু সেই গল্প হবে পরের সঙ্খ্যায়।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
অধ্যাপক, চলচ্চিত্রবিদ্যা বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ছবি

উইকিপিডিয়া
মুভিওয়ালা

পরশমণি: বাষ্প নিয়ে আরো কথা

কোন সময় এমন হয়েছে কিনা মনে করে দেখত।

ধর তুমি কোন ট্যাক্সি বা গাড়ী করে বেড়াতে যাচ্ছ আনন্দ করতে, আর ঠিক সেই সময় নামল বৃষ্টি। ব্যস। জানালা দিয়ে জলের ছাঁট আসতে শুরু করল। জানালা বন্ধ করে গরমে ভাপা ছাড়া আর গতি কি? সুতরাং সব জানালা বন্ধ হল।

ড্রাইভার কাকুর সামনের কাচ যেটা দিয়ে তিনি রাস্তা দেখেন সেটা ঝাপসা হয়ে গেল।আর তাতে তিনি কাচ মোছার যন্ত্র (ওয়াইপার) চালু করে দিলেন। এতে একটা কাজ হল। কাচটা একটু পরিষ্কার হল। পুরোটা হল না। ক্রমশঃ কাচটার ঘোলাটে ভাবটা আরও বাড়তে থাকল।

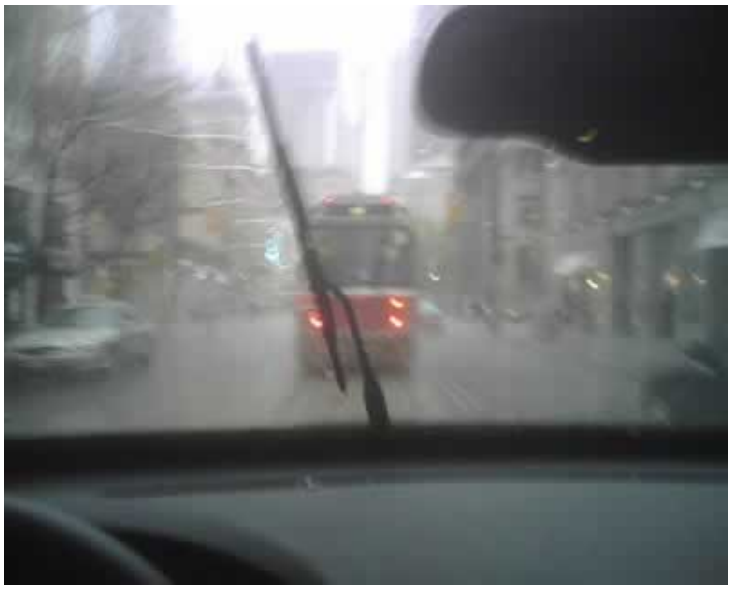

গাড়ির কাঁচ পরিষ্কার করছে ওয়াইপার

এইবার কাকু একটা কাজ করলেন, তিনি হাত দিয়ে কাচের ভেতরের দিকটা মুছে দিলেন। ওমনি সেটা সাফ হয়ে গেল। খেয়াল করে দেখ, তোমার পাশের জানালার কাচটাও কেমন যেন ঘোলাটে লাগছে। আঙুল দিয়ে দাগ কাট।আর আশ্চর্যের ব্যাপার হল কাচটা তো পরিষ্কার হলই আর তোমার আঙুলটাও ভিজে গেল।

ব্যাপারটা কি হল?সব কাচ বন্ধ, অথচ ভেতরে জল?এল কোথা থেকে? অবাক কান্ড! কান্ডটা জানতে চাও?

তাহলে ত "ইচ্ছামতীর" পুরোন সংখ্যাগুলো একটু ঘাঁটতে হয়! বাতাসে যে জলীয় বাষ্প আছে তা প্রমানের জন্য অন্ততঃ দুটো বিষয়ের কথা বলেছি সেই সব সংখ্যায়। মনে করিয়ে দিই একটু?

একটা শুকনো কাচের গ্লাসে বরফের টুকরো মেশানো জল রাখলে গ্লাসের বাইরের দিকে বিন্দু বিন্দু জল জমে যাওয়া প্রমান করে যে বাতাসে জলীয় বাষ্প আছে -- এ হল প্রথমটা, আর দ্বিতীয়টা হল সেই যে বরফের টুকরো থেকে ধোঁয়া ওঠা! মনে পড়ে?

তাহলে এবার আমাদের কথায় অর্থাৎ গাড়ীর ভেতরে জল এল কোত্থেকে সেটা জানার চেস্টা করা যাক। বাইরে ত বৃষ্টি হচ্ছিল,আর এতে কাচ ভিজে ঠান্ডা হয়ে পড়ছিল। অথচ ভেতরের বাতাসটা গরম। গরম বাতাসে থাকা জলীয় বাষ্প ঠান্ডা কাচের ছোঁয়ায় ঠান্ডা হয়ে জলবিন্দুতে পরিণত হয়ে কাচের গায়ে জমে যাচ্ছিল। এ ভাবে অনেক জমা জলবিন্দু কাচকে ঘোলাটে করে দেয়। তাইত ড্রাইভার কাকুকে হাত দিয়ে কাচ মুছতে হয় আর কাচে ঘষলে তোমার হাতের আঙুল ভিজে যায়।

কাঁচের গায়ে জমে থাকা জলবিন্দুর ওপর দিয়ে আঙ্গুল চালিয়ে এঁকে ফেলা যায় মজার ছবি

এতগুলো কথা বললাম কেন সেটা বলতে পারবে? আসলে আমাদের চার পাশে এমন সুন্দর সুন্দর ব্যাপার ঘটে, যা আমরা দেখতে পেলেও কারন জানি না। যেমন, মেঘ ও বৃষ্টি, শিশির, কুয়াশা, শিলাবৃষ্টি, তুষারপাত --এ রকম সব ঘটনা। চমতকার ব্যাপার না এসব?

তুমি যাতে বুঝতে পার তেমন সহজ করে বলার চেষ্টা করছি। প্রথমে বলি শিশিরের কথা। বর্ষার পরেই আসে শরত,কাজেই সে সময় বাতাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকে। শরতকালে রাতের দিকে মাটি যখন ঠান্ডা হয়ে যায় তখন তার কাছাকাছি থাকা বাতাসও ঠান্ডা হয়ে পড়ে। ফলে সেখানে থাকা বাষ্পও জমে জল হয়ে যায়। সেই জল ঘাসের ডগায় বা ছোট ছোট গাছের পাতায় বিন্দু বিন্দু জলের আকারে জমতে থাকে। সেটাই শিশির। শীত কালে গ্রামাঞ্চলে ঘাসে এত শিশির পড়ে যে তার ওপর দিয়ে হাটতে গেলে পা ভিজে সপসপে হয়ে যায়। হেঁটে দেখো কখনো।

ঘাস এবং পোকাটার গায়ে শিশিরবিন্দু

জলীয় বাষ্প ছাড়াও অনেক রকম ধুলিকণা,ধোঁয়া- এসব ভেসে বেড়ায় বাতাসে। এরা ঠান্ডা হয়ে গেলে তার ওপর বাষ্প জমে জলকণার আকারে ভেসে থাকে। অনেক অনেক এরকম জলকণা জমা হয়ে কুয়াশা তৈরী করে। দুপুরে কিন্তু কুয়াশা কেটে যায়। কেন বলত? দুপুরে রোদ উঠে গরম পড়লে জল আবার বাষ্প হয়ে যায় বলে।

কুয়াশায় আবছা হয়ে আছে বহুতলের মাথা

আবার কোন কারনে জলীয় বাষ্প হালকা হয়ে অনেক ওপরে উঠে গেলে সেখানে গিয়ে ঠান্ডা হয়ে ঠিক কুয়াশার মতোই জলকণায় পরিণত হয়ে ভেসে বেড়ায়। এমন একত্রে ভেসে বেড়ানো জলকণাই হল গিয়ে মেঘ। আর মেঘের মধ্যে থাকা জলকণাগুলো জুড়ে জুড়ে এক একটা বড় বড় জলবিন্দু তৈরী হয়। তখন সেগুলো যে ভারি হয়ে যায় বুঝতেই পারছ। এরাই বৃষ্টি হয়ে নীচে নেমে আসে।

আকাশ জুড়ে মেঘ -একটু পরেই বৃষ্টি নামবে

তুষার তৈরী হতে গেলে ধুলিকণা বা ধোঁয়ার কোন দরকার হয় না। খুব ঠান্ডা পড়লে জলীয় বাষ্প জমে গিয়ে বরফ হয়ে যায় আর বাতাসে ভেসে বেড়ায়। পরে বৃষ্টির মত ঝির ঝির করে পড়তে থাকে। এ হল তুষার পাত।

তুষারপাতে চারিদিক সাদা হয়ে গেছে- চলছে তুষার নিয়ে খেলা

আর কখনো কখনো বৃষ্টিকে, পড়ার সময় মাটি থেকে অনেক ওপরে কোন খুব ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে

দিয়ে আসতে হয়। তখন বৃষ্টির ফোঁটাগুলো জমে বরফ হয়ে যায়। সেই সব ছোটবড় বরফের টুকরোগুলো বৃষ্টির মত পড়তে থাকে। এর নামই শিলাবৃষ্টি। মাথায় পড়লে আর রক্ষে নেই।

নানান আয়তনের তুষার জমা শিলা - হাতে নিলে বরফের মত ঠান্ডা

ধোঁয়াশার নাম শুনেছ কখনো? ধোঁয়া আর কুয়াশা একসাথে যখন বাতাসে ভেসে বেড়ায় তখন এটা হয়। কলকাতার মত বড় বড় শহরে কুয়াশা আর গাড়ীর ধোঁয়া মিশে এরকম ধোঁয়াশা হয়। এমন হলে চারিদিক অন্ধকার অন্ধকার লাগে, সূর্যের আলো এসে পৌঁছায় না। লন্ডন শহরে একবার এরকম হয়ে বেশ কয়েক দিনের জন্য শহরটা অচল হয়ে পড়েছিল।

মহানগরের মাথায় ওপর ভেসে আছে ধূসর কালচে ধোঁয়াশা

আমি কিন্তু এইসব প্রাকিতিক ঘটনাগুলো তোমার যাতে বুঝতে সুবিধা হয় তেমন করে বললাম, বড় হয়ে এ বিষয়ে আরো বিশদে জানতে পারবে।

আজ এখানেই শেষ করি,কি বল?

সন্তোষ কুমার রায়
রূপনারায়ণপুর, বর্ধমান

ছবিঃ
উইকিপিডিয়া

কমিক্স কাহিনী: স্যান্টাক্লসের চিঠি

ক্যালভিন একটা চিঠি পেয়েছে। চিঠিটা লিখেছে স্বয়ং সান্টা ক্লজ। চিঠিতে লেখা আছে ক্যালভিনের চিন্তার কোনো কারণ নেই। সান্টা তার সব নিয়ম কানুন বদলে দিয়েছে। ক্যালভিন যেসব দুষ্টুমি করে তা সব চালিয়ে যেতে পারে। সে কথায় কথায় তার মা বাবার সাথে তর্ক করতেই পারে। সুশিকে বরফের গোলা ছুঁড়ে মারতেই পারে। এইবারের ক্রিসমাসে সান্তা ক্লজ দুষ্টু বাচ্চাদেরই উপহার দেবে। আনন্দে আত্মহারা ক্যালভিনের ঘুম ভেঙে গেলো। আরে এটা তো স্বপ্ন ছিলো। তাও ক্যালভিন চোখ বুঁজে বিছানায় পড়ে থাকে। উঠলেই সে এমন এমন কাজ করবে যাতে সান্টা তাকে খারাপ ছেলে বলেই ধরে নেবে।যদিও তার বিশ্বাস কেউ সারা দিন ধরে কখোনো বাচ্চাদের ওপর নজর রাখতে পারে না। বদমাস বাচ্চাদের জন্য একটা সান্টা ক্লজ থাকলে খুব ভালো হত। ক্রিসমাস যতই এগিয়ে আসে কেলভিনের চিন্তা ততই বাড়ে। মনে মনে ভাবতে থাকে এবার সান্টা তাকে উপহার দেবে তো?

চিন্তা হবারই তো কথা। কারণ ক্যালভিন তো কমিক্স স্ট্রিপের দুনিয়ায় একটি অতি দুষ্টু ছেলে হিসেবে পরিচিত। বয়স তার ছয় কি সাত। বিল ওয়াটারসন (Bill Watterson) তো তাকে শান্ত হয়ে এক জায়গায় বসে থাকতে শেখাননি। মা,বাবা অথবা স্কুলের টিচার যা বললো তা চোখ বুঁজে এক কথায় মেনে নেবার পাত্র সে নয়। সে থাকে তার নিজের চিন্তার জগতে।তার কল্পনায় বিরাজ করে দত্যি দানব আর ভিন গ্রহের উদ্ভট সব প্রাণীরা। পড়াশুনোয় সে লবডঙ্কা। কিন্তু তার শব্দ ভান্ডার আর পাকা পাকা কথার দাপটে যে কাউকে হার মানাতে পারে।

ক্যালভিনের জনক বিল ওয়াটারসন কিন্তু ছোট বেলায় ছিলেন খুবই শান্ত।ওহিও আর বাড়িতে তিনি নিজের মতো আঁকাআঁকি করতেন আর কমিক্সের বই পড়তেন।ক্যালভিনও থাকে তার নিজের চিন্তা জগত নিয়ে। কিন্তু তার দস্যিপানা এই কমিক্স স্ট্রিপটিকে করেছে আরো প্রাণবন্ত।তার খেলার সাথী হলো একটা জলজ্যান্ত বাঘ হবস (Hobbes)। কিন্তু আর সবার কাছে সে হল একটা পুতুল মাত্র।সে যাই হোক যে যেভাবে দেখে আর ভাবে।ক্যালভিন কিন্তু তার সমস্ত আলোচনা করে হবস এর সাথে।

বাবা-মারা তাঁদের ছোট বাচ্চাদের বলেন সারা বছর ভালো হয়ে থাকো তাহলে সান্টা তোমাদের বড়দিনের উপহার দেবেন। বাচ্চারাও সান্টার উপহার পাবার আশায় ভালো হয়ে থাকে। কোনো দুষ্টুমি করে না।কোনো প্রশ্ন না করেই শান্ত-শিষ্ট-ল্যাজ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। ক্যালভিনকেও তার বাবা মা পইপই করে বলে দিয়েছেন শান্ত হয়ে থাকার জন্য। কিন্তু ক্যালভিন জানতে চায় ভালো হয়ে থাকার...শান্ত হয়ে থাকার সংজ্ঞাটা ঠিক কী? কিভাবে সান্টা বুঝতে পারে কে ভালো ছেলে আর কে খারাপ। ক্যালভিন সান্টা ক্লজকে পরামর্শ দেয় একটা বই প্রকাশ করার জন্য। যার মধ্যে লেখা থাকবে ভালো হয়ে থাকার গুণ গুলো। একটা বাচ্চা ছেলে ভালো হয়ে থাকতেই পারে কিন্তু খারাপ ঘটনাতো ঘটেই যায়। যা বাচ্চা ছেলেটাকে দুষ্টু প্রমান করে। তাই সান্টার এই সমস্ত বিবেচনা করে একটা গাইড লাইন তৈরী করা উচিত।তাছাড়া পড়াশুনায় ভালো ছেলেরা গিফট পেতেই পারে, কিন্তু সান্টাকে খুঁজে বের করতে হবে কার মনের জোর কতটা বেশি।ক্যালভিনের আরো ডিমান্ড,ফ্রিতে গিফট দেয় বলে সান্টা যা খুশি তাই গিফট দিতে পারে না।সে ভিন গ্রহের প্রানীর সাথে লড়াই করার জন্য মিসাইল আর লঞ্চার চেয়েছিলো কিন্তু তার বদলে সান্টা তাকে দিলো মোজা আর জামা!এটা ইয়ার্কি নাকি? ছোট বলে যা খুশি তাই করবে...? ক্যালভিন জানে সান্টাকে নানা জায়গায় ঘুরতে হয়। কোথাও বা হাড় হিম করা ঠান্ডা...কোথাও বা নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু...কোথাও বরফ তো কোথাও সমুদ্র। কিন্তু তাই বলে উপহারে এত গরমিল! ভুল হবার তো একটা লিমিট আছে! সান্টা বরফের দেশে থাকে বলে একটু আদটু ভুল হতেই পারে কিন্তু তাই বলে মিসাইল আর লঞ্চারের বদলে বদলে জামা আর মোজা!

এদিকে ক্রিসমাস প্রায় এসেই গেলো...ক্যালভিন সান্টা ক্লজকে চিঠিও লিখে ফেলেছে।কিন্তু ক্যালভিনের দস্যিপনা একটুও কমেনি। তাই হবস নিজেই একটা চিঠি লিখে ফেললো ক্যালভিনকে।হবস এমন ভাব দেখালো যেন চিঠিটা এসেছে নর্থ পোল থেকে। চিঠিতে লেখা আছে ক্যালভিনের এখোনো সময় আছে ভালো ছেলে হয়ে থাকার যদি সে না থাকে তাহলে এবারে গিফট সে নাও পেতে পারে। ক্যালভিন কি এতোই বোকা যে হবসের হাতের লেখা চিনতে পারবে না, সাতসকালে তাই ক্যালভিন হবসের পিঠে দুঘা বসিয়ে দেয়।কিন্তু উপহার তার চাই...চাই। তাই সে চিঠি লিখতে বসে...

প্রিয় সান্টা ক্লজ,

আমি মেলভিল (Melville), ক্যালভিনের ছোট ভাই।এই বাড়িতে আসলে দুজন বাচ্চা আছে।...চিঠি লিখতে লিখতে সে হবসকে বলে এই চালাকিটা খাটে কিনা দেখা যাক।এই বছর দুটো চিঠি...।

তুমিও কি এবার সান্টাকে চিঠি লিখে ছিলে? কি গিফট পেলে জানাতে ভুলো না। তোমার চিঠির অপেক্ষায় থাকবো। ভালো থেকো, আর নতুন বছর অনেক অনেক আনন্দ আর খুশিতে ভরে উঠুক।

পূর্বাশা
নিউ আলিপুর, কলকাতা

ছবিঃ
ফ্যানপপ

এক্কা-দোক্কা: ঘুড়ি ওড়ানোর মজা

বাড়ির চারিদিকে কুয়াশা ঘিরে রয়েছে...আর পিপলি রোজ সকালে ক্যালেন্ডার দেখে মিলিয়ে নিচ্ছে সরস্বতী পুজো কবে। কিন্তু তোমার মনে প্রশ্ন উঁকি মারতেই পারে পিপলি রোজ কেনো ক্যালেন্ডার দেখে দিন গুনছে। সরস্বতী পুজোর আনন্দ তো আছেই...তার সাথে আছে ঘুড়ি ওড়ানোর এক দারুন মজা। পিপলি তার ছোড়দাকে ফোন করে বলেছে কাঁচের শিশি গুঁড়োতে, পিসিকে বলেছে কাঁচা বেল পাড়তে। বাবাকে বলেছে ঘুড়ি আর সুতো কিনতে আর পাড়ার সবাই যাকে দুষ্টু ছেলে বলে চেনে সেই টুপাইকে বলেছে 'টিপনি' দিতে। এমা টিপনি মানে জানো না?

আচ্ছা ঠিক আছে আগে তোমাকে মাঞ্জা সম্বন্ধে একটু জ্ঞান দিই। প্রথমে কাঁচ গুঁড়ো করতে হয় তারপর সাবু ভিজিয়ে রেখে সেই সাবু জাল দিতে হয় একে 'মাড়' বলে। মাড় ঠান্ডা হলে এর মধ্যে কাঁচের গুঁড়ো, পছন্দ মতো রঙ আর বেলের আঠা মেশাতে হয়। যে মন্ডটি তৈরী হয় সেটা মাঞ্জার প্রধান উপাদানের একটি। এরপর যে ভালো সুতো তুমি ঘুড়ি ওড়ানোর জন্য ঠিক করে রেখেছো সেই সুতো এই মন্ডের সাথে মাখাতে হয়। এটা কিন্তু একা একা করা যায় না। দুজন লাগবেই। একজন লাটাই ধরবে আর একজন মাড় মাখাবে।সব সুতোতে মাড় মাখোনো এবং লাটাই গোটানোর পর সেই মাড় মাখা লাটাই এই কনকনে শীতের রাতে খোলা আকাশের তলায় রেখে দিতে হবে। সারা রাত লাটাইয়ের গায়ে শিশির বসবে। সুতো গুলো শিশিরের স্নিগ্ধতায় চনমনে হয়ে উঠবে। তারপর দিন সকালে ঘন কুয়াশার মধ্যে সেই মাড় মাখানো সুতো লাটাই থেকে খুলে দুটো বাঁশের খুঁটির সাহায্যে এদিক-ওদিক লম্বালম্বি ভাবে লাগানো হবে।সেই লাগানোর সময় লাটাই ধরে থাকবে একজন আর আর অপর জন সেই সুতোতে টুকরো কাপড় দিয়ে ধরে টিপনি দেবে। যে যত টিপনিতে ওস্তাদ পাড়ায় তার চাহিদা অনেক। পিপলি তাই টুপাইকে বেছে নিয়েছে। টুপাই অবশ্য এসেই তার পাকাপাকা কথায় পিপলির মাথা খারাপ করে দিয়েছে..."এমা মেয়েরা আবার কেউ ঘুড়ি ওড়ায় নাকি?...এ আবার কি রে বাবা...আচ্ছা ক্যাডবেরি যখন দিবি বলেছিস তখন না হয় দিয়েই দেব...কিন্তু ভোর বেলায় উঠতে হবে...তখন দেখিস...আবার প্যানপ্যান করিস না যেন।"

পিপলি তাই এখন থেকে ভোরবেলা ওঠা প্র্যাকটিস করবে বলে বাবার মোবাইলে এ্যালার্ম দিয়ে রাখছে। কিন্তু এই কনকনে ঠান্ডায় কার আর উঠতে ভালো লাগে। এ্যালার্ম বেজে যায় আর পিপলি ঘুমের মধ্যে টুক করে বন্ধ করে দেয় মোবাইল। টুপাই এই কদিনে ঘুড়ি বিশেষজ্ঞদের মতো হাবভাব করতে শুরু করে দিয়েছে। পিপলিকে বলেছে " শুধু ঘুড়ি ওড়াবো...ঘুড়ি ওড়াবো বলে...ধেই ধেই করে নাচলেই তো

আর হবে না। ঘুড়ি সম্বন্ধে একটু আধটু পড়াশুনোও করতে হবে। পিপলি ভাবে হুম টুপাই যেন কত পন্ডিত। টুপাই ঘুড়ির নাম শোনায় পিপলিকে। আর পিপলি মনে রাখার চেষ্টা করে ঘুড়ির নাম...ময়ূরপঙ্খী,চৌখুপি,মুখপোড়া,হাঁড়িকাঠ,চাঁদিয়াল আরো কত কি...। এদের মধ্যে পিপলির সবচেয়ে ভালো লাগে ময়ূরপঙ্খীকে। আর টুপাইয়ের পছন্দ চাঁদিয়াল। সেটা আবার 'একতে'না 'দুতে'। ও বুঝতে পারলে না? এগুলো ঘুড়ির আকার। দোকানীকে গিয়ে টুপাই সব বিস্তারিত বলে। তারপর দেখে শুনে যাচাই করে ঘুড়ি কেনে। পিপলিও আস্তে আস্তে একটু একটু করে শিখছে।আর মনে মনে ভাবছে বাবাকে বরং বারণ করে দেবে ঘুড়ি আর সুতো কিনতে। সে বরং নিজেই টুপাইয়ের সাথে গিয়ে কিনে নিয়ে আসবে। সেদিন বাড়ির ছাদে একটা সাদা কাগজের ঘুড়ি পড়ে ছিলো। সকালে গাছে জল দিয়ে গিয়ে পিপলি ঘুড়িটাকে দেখলো আর পাশের বাড়ির টুপাইকে তক্ষুণি হাঁক পেড়ে দেখালো। টুপাই এমন ভাব দেখালো যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। বললো" আরে এটাতো 'চিনে'বাচ্চারা ওড়ায়। তোর কাজে লাগবে।" পিপলির রাগ হলো। পাড়ার পাঁচুর দোকানে গিয়ে আরো কয়েকটা ঘুড়ির নাম জেনে নিলো...সব চেয়ে পছন্দ হলো 'সিকিতে'।

শীতের দুপুরে ঠাম্মার সাথে ছাদে রোদ পোহাতে বসে পিপলি কত আলোচনা করে ঘুড়ি নিয়ে। আর ঠাকুমা জানায় আরো মজার নানা খবর।

"আচ্ছা বলতো মানুষ কেনো ঘুড়ি ওড়ায়?"

"কেনো আনন্দ পাওয়ার জন্য।"

"ঠিক বলেছিস। আসলে নিজেরা তো আর উড়তে পারে না তাই ঘুড়ির সাথে মনটাকে উড়িয়ে দিয়ে মজা পায়।"

বিকেল বেলা ছোড়দা কাঁচের গুড়ো দিতে এসে আরো চারটে জ্ঞান দিয়ে গেলো। "জানলি পিপলি চীন থেকেই মনে হয় আমাদের দেশে ঘুড়ি ওড়ানোর বাতিকটা আসে।শুধু আমাদের দেশে নয় অন্য দেশেও।

অনেক কাল আগে ঘুড়ি উড়িয়ে সৈন্যরা নিজেদের মধ্যে সাঙ্কেতিক ভাষায় কথাবার্তা বলতো...সন্ধি কিম্বা যুদ্ধ ঘোষণাও করতো।"

ছোড়দার কাছ থেকে দেশ বিদেশের ঘুড়ি ওড়ানোর আরো নানান মজাদার খবর জানতে পারলো পিপলি। থাইল্যান্ডে নাকি ঘুড়ি ওড়ানোর আটাত্তর রকম নিয়ম আছে! ১৭৬০ সালে জাপানে ঘুড়ি ওড়ানো বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কারন লোকজন কাজ কর্ম ফেলে রেখে বড় বেশি ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল! পৃথিবীর প্রথম ঘুড়ি তৈরি হয়েছিল প্রায় ৩০০০ বছর আগে, গাছের পাতা দিয়ে। চীনা আর জাপানিরা ড্রাগন, মাছ, প্রজাপতির মত দারুন দেখতে সব ঘূড়ি বানাতে ওস্তাদ! ঘুড়ির থেকেই কিন্তু ধীরে ধীরে এরোপ্লেন এর ভাবনা বিজ্ঞানীদের মাথায় আসে। এক-দুটি দেশ পাদে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই ঘুড়ি ওড়ানো একটা জনপ্রিয় খেলা। আর সবথেকে মজার খবরটা হল- ঘুড়ি ওড়াতে হতে মোটেও খুব জোর হাওয়ার প্রয়োজন নেই।খুব ভালো হল এইসব জানতে পেরে। এইবার পিপলিও টুপাইকে বেশ খানিকটা চমকে দিতে পারবে!

তেকোনা ঘুড়ি

অক্টোপাস ঘুড়ি

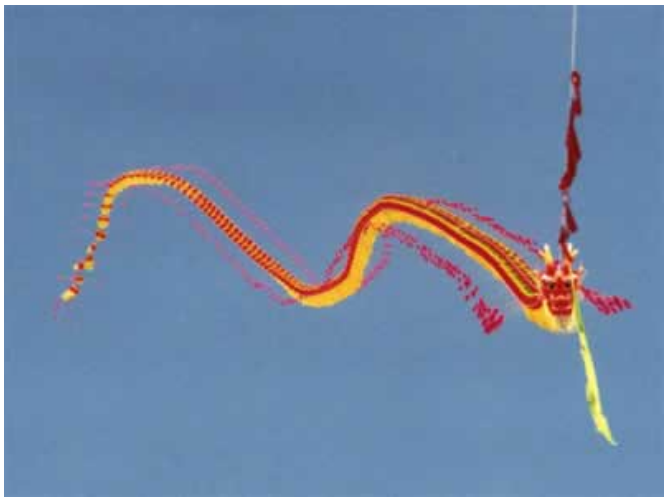

ড্রাগন ঘুড়ি

ছোড়দাকে চা করে দেয় পিপলির মা। তার সঙ্গে ঘরে বানানো কেক আর জয়নগরের মোয়া। চায়ে চুমুক আর কেকে কামড় বসিয়ে চোখ গোল গোল করে ছোড়দা আবার বকতে শুরু করে..."ঘুড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ঘুড়ি উড়িয়েই আমেরিকার বিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রনীতিবিদ বেঞ্জামিন ফ্যাঙ্কলিন (১৭০৬-১৭৯০)বিদ্যুত ও বজ্রপাতের মধ্যে বিদ্যুতের অস্তিত্ব প্রমান করেছিলেন। তাঁর সেই ঘুড়িটা অবশ্য তোর ময়ূরপঙ্খীর মতো কাগজের ছিলো না। সেটা ছিলো রেশমের কাপড় দিয়ে তৈরী। ১৭৫২ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের এক মেঘলা দিনে তাঁর সেই রেশমী ঘুড়ির মাথায় জুড়ে দিলেন একটা লোহার তার। আকাশের বিদ্যুত ঝলকের মধ্যে সেই ঘুড়ির তার দিয়েই তিনি প্রমান করেছিলেন আমাদের তৈরী তড়িতের সাথে আকাশের বিদ্যুতের কোনো পার্থক্য নেই। ঘুড়ির মধ্যে দিয়েই প্রমাণিত হলো এই শক্তি ঈশ্বরের কোনো রোষ অথবা অপদেবতার কোনো অভিসন্ধি নয়। বিদ্যু এমনই একশক্তি যাকে ছাড়া আমাদের সভ্যতা একেবারে অচল।" ছোড়দা থামলো। মোয়ার শেষ টুকরোটা মুখে পুরলো আর মা এসে ঘরের লাইট জ্বাললো। কারণ ঠাকুমা এবার সন্ধ্যে দেবে।

সকালে অনেক ঠান্ডা হওয়া সত্ত্বেও পিপলির ঘুম ভাঙলো এলার্মের আগেই। সবে পরিষ্কার হচ্ছে আকাশ। পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। আর তো কয়েকদিন পরেই সরস্বতী পুজো।

টুপাই এর ট্রেনিং কাজে লাগলো কিনা বোঝা যাবে সেইদিন। এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে পিপলি মুখ ধুতে গেলো।

প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়
বালি, হাওড়া

ছবিঃ
উইকিপিডিয়া

আঁকিবুকি

রিজওয়ান রিয়াসত অর্ক, রাজুক উত্তরা মডেল কলেজ,ঢাকা, বাংলাদেশ

সোহম চক্রবর্তী, নিভা আনন্দ বিদ্যালয়, কলকাতা

অনুভব শেঠ, ইন্ডিয়ান এমব্যাসি স্কুল, বেইজিং, চীন